রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ/১৩ চৈত্র, ১৪২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৫.০১১.০৯-৯৪—গত ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত অস্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সংহিংস ঘটনা তদন্তে প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন ও অপর দু'জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত জুডিসিয়াল তদন্ত কমিশনের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খায়রুল কবীর মেনন
উপসচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১১১০.০০

<u>গোপনীয়</u>

তদন্ত প্রতিবেদন খণ্ড-১

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১ পরবর্তী সহিংসতা।

৮ম জাতীয় সংসদ ২০০১ নির্বাচনোত্তর সহিংসতা

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, অগ্নি সংযোগসহ সকল মানবতাবিরোধী সহিংসতায় আক্রান্ত নিরীহ ব্যক্তি ও পরিবারের শোক, দুঃখ ও বেদনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছে এ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন।

তদন্ত প্রতিবেদন

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১ পরবর্তী সহিংসতা

কমিশন সদস্য ঃ

১। মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন
সাবেক জেলা ও দায়রা জজ
প্রেসিডেন্ট, তদন্ত কমিশন।

২। মনোয়ার হোসেন আখন্দ
সদস্য, তদন্ত কমিশন ও
উপ-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩। মীর শহীদুল ইসলাম
সদস্য, তদন্ত কমিশন ও
যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ডিএমপি।
(সাবেক এস এস সিআইডি,ঢাকা)।

দাখিল তারিখ : ২৪-০৪-২০১১

সহিংস ঘটনার বিষয়ে তদন্ত কমিশনের অভিব্যক্তি

(ক) **৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ পরবর্তী সহিংসতার সময়সীমা নির্ধারণ ঃ**

হিউম্যান রাইটস্ এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ নামীয় একটি মানবাধিকার সংগঠনের "Immediate after election-2001" সংঘঠিত সহিংসতার জন্য জনস্বার্থে দায়েরকৃত ৭৪৯/০৯ নং রীট মোকদ্দমায় রীট আবেদনে ও সংযুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত **১৯১** টি সহিংস ঘটনাসমূহের বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রার্থনা করা হয়। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে ২০০১ সনের নির্বাচন পরবর্তী সমগ্র বাংলাদেশে সংঘঠিত রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটনা তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। তাছাড়া মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে **''নির্বাচন পরবর্তী''** সময়ের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি তবে রায়ের পর্যবেক্ষণ ও রীট আবেদনের বিষয়বস্তু ও মৌলিক উদ্দেশ্য পর্যালোচনায় ইহা প্রতিভাত হয় যে ২০০১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর মূহুর্ত থেকে শুরু হওয়া নির্বাচন কেন্দ্রিক সীমিত মেয়াদে সংঘঠিত রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার তদন্ত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তদন্ত কমিশন গঠনের আদেশ প্রদান করা হয়। অত্র কমিশন একাধিক বিজ্ঞ সাবেক বিচারপতি, মানবাধিকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে মতবিনিময়কালে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের অভিমত জানতে চাইলে তারা জানান যে, ২০০১ সনের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা সমগ্র বাংলাদেশে ৫-৬ মাস প্রকটরূপে সংঘঠিত হলেও পরবর্তীতে ঐ ধারাবাহিকতায় আরো ৫-৬ মাস সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল। এ বিষয়ে ব্রাক (BRAC) পরিচালিত গবেষণায় ও এই সময় সীমার সমর্থন পাওয়া যায়। (সূত্র ঃ সম্প্রীতির সম্ভাবনা (পুস্তক)।

৭৪৯/০৯ রীট দাখিলকারী মানবাধিকার সংগঠনের প্রধান বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মনজিল মোর্শেদ কমিশনের সাথে কয়েকদফা বক্তব্য পেশ করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সীমিত সময়ে যে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা ঘটেছিল সে সকল সহিংস ঘটনার কারণ উদঘাটন, দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ ও অপরাধীদের শাস্তির বিধানসহ ভবিষ্যতে যেন নির্বাচনের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য এ ধরনের সহিংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা রোধের কার্যকরী ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সকলের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এ মামলা দায়েরকারী সংগঠনের উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন কমিশনের উচিত সে লক্ষেই তাদের কাজ সম্পাদন করা এবং এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে তাদের রীট দায়েরে মহৎ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। **উপরোক্ত মতামতসমূহ ও বাস্তবতা বিবেচনায় আইনগত গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার স্বার্থে বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষে অত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ১লা অক্টোবর ২০০১ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২ ইং তারিখ অর্থ্যাৎ ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী ০১ বছর ০৩ মাস সমগ্র বাংলাদেশে সংঘঠিত রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনাসমূহ তদন্তের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদিও একটি মাত্র তদন্ত কমিশনের জন্য তাহা শুধু অবাস্তব নয় অকল্পনীয় বটে।**

(খ) অত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গতানুগতিক ধারায় গঠিত তদন্ত কমিশন নয়। বাংলাদেশে শুধু নয় বরং উপমহাদেশের সুদীর্ঘ অতীতের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, নির্দিষ্ট যে কোন একটি স্পর্শকাতর জনগুরুত্বসম্পন্ন ঘটনার জন্য সাধারণত একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিশনের বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে একটি ঘটনাস্থলে সংঘটিত একটি মাত্র ঘটনা। একটি মাত্র ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাধারণত ১-৬ মাস সময় নেওয়ারও নজির রয়েছে। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সংঘঠিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা হাজার হাজার। ঘটনাস্থল সমগ্র বাংলাদেশ। প্রতিটি সহিংস ঘটনার ভিকটিম একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার। তাদের শরীর ও সম্পত্তি সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু। সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় উপজেলায় ঘটনাস্থলে সংঘঠিত হাজার হাজার সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য একটি মাত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দৃষ্টান্ত বিরল। বাস্তবতার নিরীখে এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে ব্যতিক্রমধর্মী কমিশন হিসেবে আখ্যায়িত করতে কোন সংশয় থাকার কথা নয়। অত্র কমিশন জাতি ও বিবেকের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এই প্রায় অসম্ভব ও দূরহ কাজ সীমিত সামর্থ ও জনবল নিয়ে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছে।

(গ) সরেজমিনে তদন্তকালে ও পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বিবেচনায় ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনার ধারাবাহিকতায় সমগ্র বাংলাদেশে ২০০৩-২০০৬ ইং সনে প্রায় ১৪০০০ (চৌদ্দ হাজার) হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ, দৈহিক নির্যাতন, সম্পদের ক্ষতি ও গুরুতর জখমের ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ সকল সহিংস ঘটনার ও সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। উপরোক্ত তদন্ত কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে প্রতিটি জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী পুলিশ সুপার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে একটি করে স্বল্প মেয়াদের (অনুর্ধ্ব ০২ মাসের জন্য) তদন্ত কমিটি/কমিশন গঠন করা যেতে পারে। সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে।

(বিস্তারিত প্রতিবেদন-১ ''অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মতামত ও সুপারিশ দ্রষ্টব্য,'' পৃষ্ঠা নং-৫৫)।

(ঘ) উল্লেখ্য যে কমিশনের জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তিতে অপরাধ/সহিংসতা সংঘঠনের কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা ছিল না। ফলে সমগ্র ০৫ বছরের ঘটনার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তিগণ অভিযোগ দায়ের করেছেন। মোট সংখ্যা ৫৫৭১ টি। তন্মধ্যে কমিশনের বরাবর ২০০৩-২০০৬ মেয়াদের অভিযোগ পাওয়া যায় মোট ১৯৪৬ টি তাও অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ১লা অক্টোবর ২০০১ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২ মেয়াদের সহিংসতার অভিযোগের সংখ্যা ৩৬২৫ টি। এ সকল অভিযোগ কমিশন কর্তৃক তদন্ত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঙ) উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের শাসনকালে প্রকটরূপে ধর্মীয় মৌলবাদ তথা জঙ্গীবাদের উত্থান ঘটেছিল। অত্র তদন্ত কমিশনের তদন্তকালীন সময়ে উত্থাপিত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেয়া যায় যে, ২০০১ সনে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী ৫ বৎসর মেয়াদে উক্ত জঙ্গী গোষ্ঠী সমগ্র বাংলাদেশে শতশত গ্রেনেড ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কূটনিতিক, কবি, সাহিত্যিক, পুলিশ, বিচারক, আইনজীবীসহ, বিভিন্ন পেশাজীবী ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। পঙ্গু ও আহত হয়েছে শত শত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ। সহিংস ঘটনার ধারাবাহিকতার স্বার্থে এ ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ঘটনাসমূহ এ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

সূচি

		পৃষ্ঠা
তদন্ত প্রতিবেদন খণ্ড-১ **বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন** **৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০১ পরবর্ত্তী সহিংসতা।**	* প্রসঙ্গ কথা (ভূমিকা) ৪-৪ * রীট ৭৪৯/০৯ নং পিটিশনের সংক্ষিপ্ত সার * মাননীয় বিচারপতি জনাব এ, বি, এম খায়রুল হক ও বিচারপতি জনাব মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ প্রদত্ত রায় ৯-১২ * কমিশন গঠনের গেজেট ও কর্মপদ্ধতি ১৩-১৬ * বিচার বিভাগীয় কমিশনের ইতিবৃত্ত ১৭-২০ * কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার ২১-২৫ * সহিংস ঘটনাসমূহের কারণ ও পটভূমি ২৬-৩৩ * নির্যাতনের প্রকৃতি (Types) ও বৈশিষ্ট্য ৩৪-৪০ * এক নজরে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার চিত্র ৪১-৪৩ * এক নজরে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার লেখচিত্র ৪৪-৪৭ * নির্বাচনোত্তর সহিংসতা যে সব বিভাগ/জেলা/থানায় বেশি ঘটেছিল ৪৮-৪৯ * অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মতামত ও সুপারিশ ৫০-৫৮ * নির্বাচনোত্তর সহিংসতার কয়েকটি স্পর্শকাতর ঘটনাসমূহের নমুনা ৫৯-১১৪ * প্রতিবেদনের সংখ্যা ১১৫-১১৫ * গ্রন্থপঞ্জি ১১৬-১১৮

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ভোটাধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার প্রয়োগ করেই জনগণ তাদের সমর্থন জানায় কাঙ্খিত আদর্শের প্রতি। গণতন্ত্রের এই শান্ত স্নিগ্ধ পথযাত্রায় কেহ জয়ী বা কেহ বিজিত। ২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্ত্তী জয়ী দল বা গোষ্ঠী যখন আদর্শিক কারণে অপশক্তির প্রশ্রয়ে ও আগ্রাসনে প্রতিরোধহীন তখন অসম্ভব ঘটনা ঘটতেই পারে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম, বর্বরোচিত কালো অধ্যায়ের সূচনা ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর।

প্রসঙ্গ কথা ঃ

প্রতিহিংসার রাজনীতিতে মানবতা লাঞ্চিত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লন্ড-ভন্ড। মহান মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা বিরোধী শক্তি বাংলাদেশ জুড়ে শুরু করে নারকীয় তান্ডব। এদের সংঘঠিত হত্যা, ধর্ষণ, সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ, সম্পদ লুন্ঠন, জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, শারীরিক নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগের মতো অসংখ্য ঘটনায় মানবতা ক্রন্দনরত। বিদীর্ন বাংলাদেশ।

নির্মম। পাশবিক। জান্তব আক্রোশ। হিংস্রতা। প্রতিটি ঘটনা যেন মথিত হৃদয়ের বেদনার্ত সমগ্রতা নিয়ে জীবন্ত অসহায় চিৎকারে বলেছে ঃ এই কি আমাদের জন্মভূমি। অশ্রু, আর্তনাদ, নীরব বেদনা, হৃদয়ানুভূতি ও উপলব্ধির বিবেক যন্ত্রণায় বিদ্ধ এই প্রতিবেদন- রুদ্ধকালের ঘটনাপঞ্জি।

রীট পিটিশনের সংক্ষিপ্তসার। আবেদনকারী, প্রতিপক্ষ, বিষয়বস্তু ও প্রার্থীত প্রতিকার

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)
WRIT PETITION NO 749 OF 2009.
IN THE MATTER OF :
Advocate Asaduzzaman Siddique and others.
.....Petitioners.
-V E R S U S-

1. Bangladesh, Represented by the secretary, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, Ramna, Dhaka and others.

.....Respondents.

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO 749 OF 2009.
IN THE MATTER OF :

An application under Article 102(2)(a)(i) of
the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF :

Public Interest Litigation (PIL)

AND

IN THE MATTER OF :

1. Human Rights and Peace for Bangladesh (HRPB), Represented by the Secretary of the Executive Committee, Advocate Asaduzzaman Siddique, Hall No. 2 Supreme Court Bar Association Bhaban, Dhaka, Bangladesh.
2. Advocate Sarwar Ahad Chowdhury, Hall No. 2. Supreme Court Bar Association Bhaban, Dhaka, Bangladesh, And 3/14 Bashbari Bosila Road, Mohammadpur, P.S: Mohammadpur, Dhaka.
3. Advocate Md. Aklas Uddin Bhuiyan, Hall No. 2, Supreme Court Bar Association Bhaban, Dhaka and 3 Agamashi Lane, P.S.: Kotwali, Dhaka.
4. Advocate Tapan Kanti Das, Hall No. 2. Supreme Court Bar Association Bhaban, Dhaka, Bangladesh, and 89 Lutfor Rahman Lane (2nd Floor), Suiritola, Dhaka-1100.
5. Advocate Forhad Ahmed, Room No. 342 Supreme Court Bar Association Annex Bhaban, Dhaka, Bangladesh, and 40 Malibagh Choudhurypara, DIT. Road, Dhaka-1217.
6. Advocate Sheikh Atiar Rahman, Son of Late Sheikh Abdur Rahman, Hall No. 2, Supreme Court Bar Association Bhaban, Dhaka, Bangladesh and House No. 6, Road No. 21, Block-C, Section 10, Mirpur, Dhaka.
7. Advocate Swapan Kumar Das, Hall No. 2, Supreme court Bar Association Bhaban, Dhaka. Bangladesh, and Room No. 306 Annex Building, Supreme Court Bar Association Bhaban, Dhaka.

.....Petitioners

-V E R S U S-

1. Bangladesh, represented by the Secretary, Ministry of Home Affairs, Bangladesh Secretariat, P.S. Ramna, District- Dhaka.
2. The Secretary, The office of the prime Minister, Tejgaon, Dhaka.
3. The Secretary (Cabinet Division), the Government of Bangladesh, Bangladesh Secretariat, P.S. Ramna, District-Dhaka.
4. Inspector General of Police(IGP), Police Bhaban, Phulbaria, P.S. Ramna, District- Dhaka.
5. The Additional Inspector General of Police (Head Quarter), Police Bhaban, Phulbaria, Police station-Ramna, District- Dhaka.

6. The Deputy Inspector General (D.I.G), Bangladesh Police, Dhaka Range, Dhaka Division, Dhaka.
7. The Deputy Inspector General (D.I.G), Bangladesh Police, Chittagong Range, Chittagong Division, Chittagonj.
8. The Deputy Inspector General (D.I.G), Bangladesh Police, Rajshahi Range, Rajshahi Division, Rajshahi.
9. The Deputy Inspector General (D.I.G), Bangladesh Police, Khulna Range, Khulna Division, Khulna.
10. Deputy Inspector General (D.I.G), Bangladesh Police, Barishal Range, Barishal Division, Barishal.

.....Respondents.

AND

IN THE MATTER OF.

Inaction of the Respondents to protect persons and the properties of the citizens and failure to perform the duties to take legal action against the miscreant/terrorist/accused of the incident took place immediate after the 8th parliament election held in 2001.

AND

IN THE MATTER OF.

For a Direction upon the respondents to from a Judicial commission to find out the reason about the failure to perform the duties of law enforcing agencies to give protection to life and properly of the citizen at the time of immediate after the 8th parliament election held in 2001.

AND

IN THE MATTER OF :

For a direction upon the respondents to take legal steps against the persons who ignored the responsibility vested upon them as per the constitution.

AND

IN THE MATTER OF :

For a direction upon the respondents to take legal steps against the miscreant-terrorist. persons who were engaged in the offences committed immediate after the 8th parliament election held in 2001 as reported in the news paper (as of annexure-A) and stated in para in 9-12 of the writ petition.

To

Mr. Justice M.M. Ruhul Amin, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh and his companion Judges of the said Hon'ble Court.

The humble petition of the petitioners above named most respectfully:-

.....
.....
.....
.....
.....

Wherefore, it is humbly prayed that your Lordships may graciously be pleased to—

a) Issue a Rule Nisi calling upon the respondents to show cause as to why the Inaction of the Respondents to show cause as to why the Inaction of the Respondents to protect persons and the properties of the citizens and failure to perform the duties to make legal action against the miscreant/terrorist/accused of the incident took place immediate after the 8the parliament election held in 2001, should not be declared illegal and unconstitutional and why direction should not be given upon the respondents to take legal steps against the persons who ignored the responsibility vested upon them as per the constitution and why direction should no be given upon the respondents to take legal steps against the miscreant/terrorist/accused who were engaged in the offences committed immediate after the 8the parliament election held in 2001.

b) Pending hearing of the Rule, the respondents may be directed to form a judicial commission regarding the incidents stated in para 9-12 of the writ petition and reported in the daily news paper (as of annexure-A) and submit a detail report within 3 months before this Hon'ble Court.
c) Upon hearing the parties and after perusing the cause shown, if any, make the Rule absolute.
d) Pass such other and further order and/or orders, as your lordships may deem fit and proper.

And for this act of kindness your petitioner as in duty bound shall ever pray.

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব এ, বি, এম খায়রুল হক ও বিচারপতি জনাব মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ কর্তৃক প্রদত্ত রায়।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিন্যাল জুরিসডিকশান)

রীট পিটিশন নং- ৭৪৯/২০০৯

ইন দি ম্যাটার অফ ঃ

ইহা বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে একটি আবেদনপত্র;

এবং

ইন দি ম্যাটার অফ ঃ

এ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান গং

..... দরখাস্তকারীগণ

বনাম

বাংলাদেশ গং

..... প্রতিবাদীগণ

জনাব মনজিল মোরসেদ এ্যাডভোকেট

..... দরখাস্তকারীগণের পক্ষে

শ্রীযুক্ত করুণাময় চাকমা এবং

জনাব মোস্তফা জামান ইসলাম, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেলদ্বয়

..... ১নং প্রতিবাদী পক্ষে

শুনানী মে ০৫, ২০০৯ ইং

রায় প্রদান ঃ মে ০৬, ২০০৯ ইং।

উপস্থিত ঃ

বিচারপতি জনাব এ, বি, এম খায়রুল হক

এবং বিচারপতি জনাব মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ

বিচারপতি এ, বি, এম খায়রুল হক ঃ

২০০১ সনে বাংলাদেশ অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তীকাল সময়ে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সহিংস ঘটনা সত্বেও সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া অত্র জনস্বার্থমূলক রীট মোকাদ্দমাটি হিউম্যান রাইট্স এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচ আর পিবি) সংস্থাটি এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ৬ (ছয়) জন এ্যাডভোকেট দায়ের করিয়াছেন।

এই দরখাস্তে বলা হয় যে, মোকাদ্দমাটি হিউম্যান রাইট্স এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচ আর পিবি) সংস্থাটি বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষার প্রচেষ্টায় নিয়ত। এই সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হইবার ঘটনা ঘটিলে তাহা আইনগতভাবে প্রতিকারের প্রচেষ্টা করে। ২-৭ নং দরখাস্তকারীগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট, তাহারাও এই সংস্থার সহিত জড়িত। ১নং দরখাস্তকারী সংস্থা প্রতিবাদীগন বরাবরে ২৯/০১/২০০৯ ইং তারিখে একটি Demand of Justice Notice জারী করতঃ ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত জঘন্য ঘটনাবলী সম্পর্কে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করিবার জন্য প্রতিবাদীগণকে অনুরোধ করা হয়। (এ্যানেকচার-বি) কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় তাহারা অত্র রীট মোকাদ্দমাটি দায়ের করিলে অত্র আদালত বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতিবাদীগণ বরাবরে ০২/০২/২০০৯ তারিখে নিম্নলিখিত Rule NISI জারি করে ঃ

``Let a Rule Nisi be issued calling upon respondents to show cause as to why a direction should not be given to from a Judicial Commission regarding the incidents occurred after the 8th Parliamentary Election as stated in paragraph 9 to 12 of the writ petition and reported in the daily news papers (Annexure-A) and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is made returnable within 4 (four) weeks from date. Let this Rule come up in the list for hearing on 04.03.2009 Requisites to be put in at once.''

বাংলাদেশ সরকার ১ নং প্রতিবাদী পক্ষে ১৫/০৪/২০০৯ তারিখে হলফকৃত একটি এফিডেবিট ইন অপজিশন দাখিল করা হয়। উক্ত এফিডেবিট ইন অপজিশনে রীট মোকাদ্দমার দরখাস্তে আনীত বর্ণনা ও বক্তব্য সম্বন্ধে কোন তথ্যগত প্রতিবাদ উত্থাপন করা হয় নাই।

জনাব মনজিল মোরসেদ এ্যাডভোকেট, দরখাস্তকারীগণের পক্ষে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অন্যদিকে শ্রীযুক্ত করুনাময় চাকমা এবং জনাব মোস্তফা জামান ইসলাম, ডেপুটি এ্যাটনী জেনারেল ১নং প্রতিবাদী পক্ষে তাহাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

জনাব মনজিল মোরসেদ বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট তাহার দরখাস্ত ও ইহার সহিত সংযুক্ত সংবাদ পত্রে বিভিন্ন অংশ (ক্লিপিং) এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ-পূর্বক নিবেদন করেন যে, ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ০১/১০/২০০১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তৎপরবর্তী বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর উপর প্রচণ্ড রকম নীপিড়ন অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খুন ও জখম করা হয়, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, রাহাজানি, লুন্ঠন, নারী ধর্ষণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে দরখাস্তের সহিত সংযুক্তি এ্যানেকচার-এ সিরিজ ব্যতিরেকে আরও বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ঘটনাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাহা ছাড়া, তিনি বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে ২০০১ সনের অক্টোবর ৩ হইতে ডিসেম্বর ৩১ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত পৈশাচিক ঘটনাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উক্ত সকল ঘটনাবলীর আলোকে তিনি নির্বাচন পরবর্ত্তী সহিংস ও পৈশাচিক নির্যাতনের ব্যাপারে তদন্তের আবেদন করেন। তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভোলার একটি ঘটনা বর্ননা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুতভাবে বলেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন দুর্ভাগা মা তাহার অপরিণত বয়স্ক কন্যাকে ধর্ষকদের হাত হইতে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়া কান্নাজড়িত কন্ঠে অনুরোধ করিয়াছিল যে বাবারা আমার মেয়ে ছোট, তোমরা একজন একজন করে যাও। ঐ সময়কার পৈশাচিক ঘটনাবলী স্মরন করিয়া বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মহোদয় বলেন যে, আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের লোকেরাও এইরূপ বর্বর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা বাংলাদেশে ৮ম সাধারণ নির্বাচন পরবর্ত্তী সময়ে সংঘঠিত হইয়াছিল।

এইরূপ পৈশাচিক ঘটনা ২য় মহাযুদ্ধকালীন সময়ে পোলাডেও ঘটে নাই যাহা বাংলাদেশে ঘটেছিল। সরকার পক্ষের দাখিলকৃত এফিডেবিট ইন অপজিশান এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তিনি নিবেদন করেন যে, বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন সহিংস ঘটনাবলীর ও নির্যাতন মূলক ঘটনাবলীর জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিবার জন্য সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করিতেছেন বিধায় তিনিও এইরূপ একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিবার প্রার্থনা করেন। যাহাতে চিহ্নিত দুস্কৃতিকারীগণের শাস্তি বিধান হইতে পারে। অন্যথায় লজ্জিত মানবতা ও ন্যায় বিচার পুনরুদ্ধার হইবে না এবং সংবিধানের মানবাধিকার নিশ্চিত করিবার যে অঙ্গীকার রহিয়াছে তাহা ভূ-লুণ্ঠিত হইবে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞ ডি, এ, জি বলেন যে দরখাস্তকারী পক্ষের উক্ত প্রার্থনা সমন্ধে সরকার পক্ষ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতেছে না।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবন এবং সংযুক্ত কাগজাদি (এ্যানেকচার-এ সিরিজ) এবং এতদসংক্রান্ত বহুবিধ পুস্তক যাহাতে ০১/১০/২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সহিংস নির্যাতনমূলক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ননা রহিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষন করা হইল। তাহাছাড়া, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত জাতীয় সম্মেলন ২০০২ তে প্রকাশিত পুস্তকেও এ সমন্ধেও বিশদ বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। সহিংসতা এবং নির্যাতন মূলক ঘটনাবলীর যে বর্ণনা উক্ত বিভিন্ন দলিলাদিতে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সত্য হইলে নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার ভূ-লুণ্ঠিত হইয়াছিল যদিও মানবাধিকার রক্ষা করিবার অঙ্গীকার বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে নিশ্চিত করা হইয়াছে। তবে দরখাস্ত, তৎসংযুক্ত কাগজ ও পুস্তক ও দলিলাদিতে বর্ণিত নৃশংস ও সহিংস ঘটনাবলী সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রদান করা সমীচীন হইবে না। কারণ অত্র দরখাস্তে সংশ্লিষ্ট সময়ে সংঘঠিত সহিংসতার ঘটনাবলী সমন্ধে একটি তদন্ত কমিশন গঠন সম্পর্কে প্রার্থনা করা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সংশ্লিষ্ট সময়ে তৎকালীন সরকার পক্ষে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতঃ তখনই একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিলে মানবাধিকার কিছুটা হইলেও রক্ষা হইত। যেহেতু দরখাস্তে ইহার সহিত সংযুক্ত কাগজাদিতে এবং দাখিলকৃত দলিলাদিতে মানবাধিকার ভঙ্গের অসংখ্যা ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে যাহা জাতীর বিবেককে নাড়া দিতে বাধ্য। এমন অবস্থায় বিলম্বে হইলেও আমরা মনে করি যে একটি তদন্ত কমিশন গঠন হওয়া উচিৎ।

উক্ত কমিশন মানবাধিকার ভঙ্গের প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করিবে। অন্যাথায় যদি দরখাস্তকারী পক্ষে উত্থাপিত অভিযোগ সত্য হয় তাহা হইলে বর্ণিত র্ববর, পৈশাচিক ঘটনাবলী যাহারা বিবেকহীনভাবে ঘটাইয়াছে এই জাতি তাহাদের সম-অপরাধে অপরাধী হইবে, সংবিধানের মূলনীতি ও আদর্শ ভঙ্গ হইবে এবং বিশ্বের দরবারে বর্বর জাতি হিসাবে আমাদের পরিচিতি হইবে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করাটাই সমীচীন হইবে বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে।

এমতাবস্থায়, আমরা প্রতিবাদীগণকে The Commission of Inquiry Act, 1956 (Act No VI of 1956) আইনের আওতায় ২০০১ সনের ১লা অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী সময়ে সংঘটিত কথিত নৃশংস পৈশাচিক ও বর্বর ঘটনাবলীর বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর এবং বিরোধী দলের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ সম্পর্কে একটি পূণাঙ্গ তদন্ত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল।

এই তদন্ত কমিশন উপরে বর্ণিত আইনের আওতায় গঠন করা হইবে। প্রতিবাদীগণকে অত্র রায় প্রাপ্তির ০২ মাসের মধ্যে উক্ত তদন্ত কমিশন গঠন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। উক্তরূপ গঠিত তদন্ত কমিশন আগামী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তাহাদের প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধীগনকে 'অপরাধী' ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন পরিচয় নাই। তদন্ত কমিশন সম্পন্ন নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রতিবাদীগণ প্রচলিত আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা প্রয়োজন হইলে প্রতিবাদী পক্ষ অথবা দরখাস্তকারী অত্র আদালতের নিকট দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করিতে পারিবেন। এই প্রেক্ষাপটে অত্র রীট মোকদ্দমাটি continuing mandamus হিসাবে গন্য করা হইল।

উপরোক্ত মন্তব্য এবং নির্দেশনা প্রদান সহকারে বিনা খরচায় অত্র রুলটি এ্যাবসলিউট করা হইল।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জনাব মনজিল মোরসেদ এবং প্রতিবাদী পক্ষের শ্রীযুক্ত করুনাময় চাকমা এবং মোস্তফা জামান ইসলাম, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল মহোদয়গণের অক্লান্ত পরিশ্রম ধন্যবাদ যোগ্য।

অ. ই. গ. Khairul Haque.

আমি একমত

Md. Mamtaj Uddin Ahmed.

বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ

Type by : স্বাক্ষর অস্পষ্ট, তারিখ ০৭-১০-২০০৯
Read by : স্বাক্ষর অস্পষ্ট, তারিখ ০৭-১০-২০০৯
Exd by : স্বাক্ষর অস্পষ্ট, তারিখ ০৭-১০-২০০৯

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন সম্পর্কিত গেজেট বিজ্ঞপ্তি	**গেজেটের ফটোকপি অত্র পেজে যোগ করতে হবে।**

বিচার বিভাগীয় কমিশনের ইতিবৃত্ত ঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরবর্তী ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এই চেতনাই বাংলাদেশের সংবিধানের মূল দর্শন। সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের দর্শন যেখানে প্রতিফলিত হয় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি । একটি রাষ্ট্র কতটুকু সভ্য আধুনিক জনগণের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি কতটুকু দায়বদ্ধ তার পরিচয় পাওয়া যায় সে দেশের সংবিধানে। নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায় এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের দায় নিশ্চিত করে সংবিধান। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের দর্শন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আদি সংবিধানকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান মর্যাদা প্রদান করেছে। এক কথায় বলা যায় ১৯৭২ সালের এই সংবিধান বিশ্ব নন্দিত যুগান্তকারী দলিল যার মূল চরিত্র বা চেতনা ছিল স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ। কেননা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের চেতনায় সমৃদ্ধ ছিল মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম।

ইতিহাসের জঘন্যতম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বিকৃত মানসিকতার ঘৃণ্যতম উদাহরণ সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর হত্যাকাণ্ড। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির প্রতিশোধ পরায়নতায় ষড়যন্ত্রমূলক সুপরিকল্পিত জঘন্যতম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে স্বাধীনতার মূল চেতনাসমূহকে বিকৃত ও ভূ-লুন্ঠিত করা হয়। সদম্ভ আত্মপ্রকাশ ঘটে সামরিক তন্ত্রের। পশ্চাতপদ নীতি অনুসৃত হতে থাকে নব্য পাকিস্তান সৃষ্টির দুঃস্বপ্নে।

সাংবিধানিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা তথা জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতার মূল চেতনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে সংবিধানের মূল চেতনা অনুযায়ী অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের নিরূপদ্রব কার্যকারীতার স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় ও আমাদের সংবিধানের ৫৮ ধারায় ৫৮ বি আর্টিকেল সংযোজিত হয়। জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে একটি প্রশ্নাতীত এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক এই সংগ্রামে দমন নিপীড়ন জেল জুলুম ও সহিংসতার ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। দলনিরপেক্ষ রাজনীতি বিবর্জিত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক ১০ জন উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা ও ৯০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অর্থাৎ নির্বাচিত দল বা গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। সংবিধানের এই সংযোজিত বিধানের আলোকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। ১৬ই জুলাই ২০০১ হতে ৯ই অক্টোবর ২০০১ তারিখ পর্যন্ত এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ০২ মাস ১৫ দিন এবং নির্বাচনের পরে ০৯ দিন এই সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ২০০১ সালের ১৬ই জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার সংগে সংগে সমগ্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সদ্য বিদায়ী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক

দলের নেতা কর্মী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতনের খবর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হতে থাকে। এই রাজনৈতিক সহিংসতা দমনের প্রশ্নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রহস্যজনক নীরবতা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যহত থাকাকালীন ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পরপরই ক্ষমতাশীন বিএনপি-জামাত দল বা জোট সমর্থক রাজনৈতিক দলের নেতা ও সশস্ত্র ক্যাডার কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে নবতর আঙ্গিকে প্রকট রাজনৈতিক সহিংসতা অর্থাৎ নির্বাচনের বিজিত আওয়ামীলীগের দলের নেতা ও কর্মী এবং বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর উপর যে বর্বরোচিত জঘন্যতম নজিরবিহীন নির্যাতনের নগ্নচিত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় তা প্রত্যক্ষ করে জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা সৃষ্টি হয়। মানবতা ভূ-লুণ্ঠিত হওয়ায় এই ঘটনসমূহ প্রত্যক্ষ করে জাতি হয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রে দীক্ষিত এই রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রাষ্ট্র এবং প্রতিটি স্তরে সরকার পরিচালনার বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগের ৮ ও ১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। স্বীকৃত মতে এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করা হয় ভোটের মাধ্যমে। এই ভোটের অধিকার অর্থাৎ নিজের পছন্দ মত প্রার্থীকে ভোট দান বা পছন্দের রাজনৈতিক দল বা জোটকে সমর্থন করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি বিজয়ী রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর নেতা বা কর্মী কর্তৃক বিজিত দলের নেতা ও কর্মীদের লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, নিপীড়িত হওয়ার ঘটনা সভ্য সমাজে শুধু নিন্দনীয় নয়, অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত, ঘৃণীত ও দুঃখজনক। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী ভিন্নমতালম্বী রাজনৈতিক নেতা,কর্মী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর রাজনৈতিক সহিংসতার প্রকটরূপ তৎকালীন পত্র পত্রিকায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়। সারা বিশ্বের দৃষ্টি নিবন্ধিত হয় বাংলাদেশের সহিংস ঘটনাবলীর উপর। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ ও সচেতন নাগরিক সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, সেচ্ছাসেবী ও পেশাজীবী সংগঠনসহ সমাজের সকলস্তরের মানুষ এক ও অভিন্ন ভাষায় সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখে। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এর রিপোর্টে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। সাউথ এশিয়ান কোয়ালিশন against fundamentalism নামের একটি মানবাধিকার সংগঠনের বরাত দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার প্রতিবেদনে নির্বাচন পরবর্ত্তী সহিংসতার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তথা গার্জিয়ান, নিউওয়ার্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোষ্ট, ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল, টাইম এবং The Nation, Far Eastern Economic Review এর মত পত্রিকায় ও সাময়িকীতে বাংলাদেশের নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতা, মৌলবাদের উত্থান, সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে । এরই ধারাবাহিকতায় ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজিত রাজনৈতিক দলের সমর্থনে সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে ২০০১সালের ১৪ ও ১৫ই ফেব্রুয়ারি Crime against Humanity শিরোনামে ঢাকায় একটি জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন মানবাধিকার কর্মী ও নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এই নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার নিন্দা প্রকাশ করেন এবং এই নিন্দনীয় ও বর্বরোচিত দুঃখজনক ঘটনাসমূহের জন্য ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামাত জোট সরকার এর প্রতি সহিংসতা বন্ধের জন্য আহ্বান জানানো হয়। মানবাধিকার সংরক্ষণ ও এর মৌলিক বিষয়সমূহ প্রচারে অনবদ্য ভূমিকা পালনের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আসমা জাহাঙ্গীর ঢাকায় এসে জাতীয় কনভেনশনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, আইন ও শালিস কেন্দ্র বাংলাদেশ হিন্দু , বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, প্রিপ ট্রাষ্ট, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, আইনজীবী সমন্বয় পরিষদসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী রাজনৈতিক ভিন্নমতালম্বী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মাঠ পর্যায়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে ও তা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আইন ও শালিশ কেন্দ্র মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সহিংসতা রোধ ও প্রতিকার প্রার্থী হয়ে ৬৫৫৬/২০০১ নং রীট পিটিশন দায়ের করে। উক্ত রীট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাছে রাজনৈতিক সহিংস ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হলেও তৎকালীন সরকারের অনীহার কারণে উক্ত রীট পিটিশনটি অনিষ্পন্ন থাকে। পরবর্তীতে Human Rights and Peace for Bangladesh নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন ০১/০২/২০০৯ তারিখে ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা ঘটনার বর্ণনা প্রদানপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত কতিপয় নির্দেশনা জারীর প্রার্থনায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৭৪৯/২০০৯ নং রীট পিটিশন দায়ের করে। রীট মোকাদ্দমায় নিম্নরূপ প্রতিকার প্রার্থনা করা হয়।

২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ, সাধারণ নাগরিকদের/জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা, জড়িত সন্ত্রাসী বা অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের নিষ্ক্রীয়তা ও ব্যর্থতার কারণ উদ্‌ঘাটনসহ সংবিধান প্রদত্ত দায়দায়িত্ব উপেক্ষা করায় রাষ্ট্রপক্ষ/প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রুল ইস্যু করতঃ ব্যাখ্যা প্রদান ও উক্ত সকল কার্যক্রম বেআইনী ও অসাংবিধানিক ঘোষণা, এবং

সহিংস ঘটনাসমূহে জড়িত সন্ত্রাসীদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

রুলের শুনানী ও নিষ্পত্তি সাপেক্ষে রীট পিটিশনে বর্ণিত এবং পিটিশনে সংযুক্ত জাতীয়পত্র পত্রিকায় ও বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্বাচনত্তোর দেশব্যাপী সহিংস ঘটনাসমূহের বিচার, বিভাগীয় তদন্তের নিমিত্ত তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ প্রদানের প্রার্থনা করা হয়। উক্ত রীট পিটিশনে সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, পুলিশ বিভাগের প্রধানসহ অন্যান্যদের প্রতিপক্ষ হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। মূলতঃ রাষ্ট্রপক্ষ মূল প্রতিপক্ষ।

০১/০২/২০০৯ তারিখে দায়েরকৃত ৭৪৯/০৯ নং রীট মোকদ্দমাটি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে গত ০৫/০৫/২০০৯ তারিখে রাষ্ট্রপক্ষ ও আবেদনকারীপক্ষের শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর গত ০৬/০৫/২০০৯ তারিখে রীট মোকদ্দমাটি চলমান (Continious mandamous) গণ্যে মাননীয় বিচারপতি জনাব এ,বি,এম খায়রুল হক ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মমতাজ উদ্দিন আহম্মদের দ্বৈতবেঞ্চ প্রদত্ত আদেশে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে সহিংস ঘটনাসমূহের জন্য তৎসময়ে ক্ষমতাসীন সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করলে মানবধিকার কিছুটা রক্ষা করা সম্ভব হত। রীট পিটিশনে বর্ণিত ও সংযুক্ত তথ্যাদি যদি সত্য হয় তবে বিষয়টি অত্যান্ত স্পর্শকাতর, মর্মান্তিক, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী এবং সচেতন নাগরিক সমাজ ও আদালতের দৃষ্টিতে উদ্বেগজনক মন্তব্য করতঃ বিলম্ব হলেও সংবিধানের মূলনীতি আদর্শ রক্ষাকল্পে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতা বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা, সম্পত্তি দখল, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন প্রকৃতির সহিংস ঘটনার তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তে কমিশন গঠন করা উচিৎ মর্মে পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়। উক্তরূপ পর্যবেক্ষণের আলোকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য সরকারের প্রতি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের চূড়ান্ত আদেশ জারি করা হয়।

উক্ত নির্দেশ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Commisions of Inquary Act. 1956 অনুবলে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে গত ২৭/১২/২০০৯ তারিখে স্বঃমঃ (আইন-২)তদন্ত কমিশন/১-৫/২০০৯/৭১৭ নং গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারী করে। গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তদন্ত কমিশনের নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয় ঃ

(ক) ঘটনাসমূহের পটভূমি

(খ) ঘটনার কারণ, ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং

(গ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মতামত ও সুপারিশ।

সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রচারের প্রায় ৫ সপ্তাহ পর বিলম্বে কমিশনের জন্য অফিস বরাদ্দ দেওয়া হয়। টেলিফোন সংযোগ, জনবল নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর ০৮/০২/২০১০ তারিখে কমিশন পুনঃ উদ্দ্যমে কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়। অতীব প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, আসবাবপত্র, যানবাহন, জনবল নিয়োগসহ ষ্ট্রেশনারী দ্রব্যাদি সরবররাহে অহেতুক বিলম্ব কমিশননের কাজকে ব্যাহত করেছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সার

১। **গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, মতবিনিময় এবং তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ঃ**

The Commissions of Inquiry Act 1956 (Act vi of 1956) এর ধারা ৩ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠিত তদন্ত কমিশন উক্ত Act এর Section 5 এর Sub-Section (2) (3) (4) (5) এবং (6) এর সকল বিধান প্রয়োগ করতে পারবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। গত ০২/০২/২০১০ ইং তারিখে প্রথম কমিশন কর্তৃক জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তি বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারসহ সকল জাতীয় পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত হয়।

গণবিজ্ঞপ্তিতে ২০০১ সনের নির্বাচন পরবর্ত্তী সংঘঠিত সহিংস ঘটনা যথা হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, বসতবাড়ী উচ্ছেদ, ভূ-সম্পত্তি দখল, নির্যাতন-নিপীড়নসহ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে আক্রান্ত (ভিকটিম) ব্যক্তি, জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলসমূহকে তাহাদের অভিযোগের বর্ণনা, সাক্ষ্য প্রমাণ, ছবি, সিডি বা অন্য কোন তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত কমিশনে হাজির হয়ে বা লিখিতভাবে বা ডাকযোগে দাখিল করার জন্য আহবান জানানো হয়।

বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, তথ্য অধিদপ্তরসহ জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকগণকে গণবিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। একই সাথে আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী, পেশাজীবী, মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে সহিংস ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত, সংবাদ, সংরক্ষিত ও প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিবরণ ইত্যাদি সরবরাহ করে কমিশনকে সহায়তা প্রদানের জন্য পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়। প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের পর সহিংসতার ব্যাপকতার অনুপাতে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় পরবর্ত্তীতে ১৫ই মার্চ ২০১০ পর্যন্ত অভিযোগ দাখিলের সময় সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা ব্যাপকভাবে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রচার করা হয়। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় প্রশাসন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামগঞ্জে হাটে-বাজারে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে।

দীর্ঘদিন প্রায় ৯ বছর পূর্বে সংঘটিত ঘটনা, সহিংসতার ব্যাপকতা, অধিকাংশ ঘটনাস্থল প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, আক্রান্তগণের মধ্যে নিম্নবিত্তদের আধিক্য এবং ভিকটিমদের উদ্ধুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বাস্তব ও যৌক্তিক কারণ বিবেচনায় অবশেষে অভিযোগ দাখিল ও সাক্ষ্য গ্রহণের সময় সীমা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। পরবতীতে পেশাজীবী, স্বেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার সংগঠন-সমূহ যথা Human Rights and peace for Bangladesh, আইন ও শালিস কেন্দ্র, হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ,

আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, ৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, নাগরিক অধিকার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটিসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুপারিশ ও পরামর্শ গ্রহণ করে। উক্ত সংগঠনসমূহ তাদের কাছে রক্ষিত সহিংসতার তথ্য উপাত্ত দিয়ে কমিশনকে সহায়তা করেছে। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডঃ আনিসুজ্জামান, বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যরিষ্টার আমিরুল ইসলাম, জনাব ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বিজ্ঞ আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সঃ মঃ রেজাউল করিম, হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদ নেতা এ্যাডভোকেট রানা দাস গুপ্ত ও এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক শাহারিয়ার কবির, ডঃ মুনতাসির মামুন, সম্প্রীতির সম্ভাবনা বইয়ের লেখক গবেষক ডঃ রফি তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করেছেন। কমিশনের অনুরোধে Human Rights and peace for Bangladesh, এর প্রধান বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মনজিল মোরশেদ জনস্বার্থে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং- ৭৪৯/০৯ মামলার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে কমিশনের কার্যক্রমে সহায়তা করেছেন। কমিশন মনে করে এই মানবাধিকার সংগঠনের জনস্বার্থে দায়েরকৃত রীট ৭৪৯/০৯ নম্বর মোকাদ্দমার কারণে বাংলাদেশে ২০০১ সালে নির্বাচনোত্তর সংঘটিত সহিংসতার একটি কালো অধ্যায়ের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে এবং জাতির প্রত্যাশা ও পূরণ হয়েছে। নির্যাতিতদেরও আদালতের মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও দৈনিক জনকণ্ঠ তাদের সংরক্ষিত তথ্য চিত্র, সংবাদ প্রতিবেদন কমিশন বরাবর প্রেরণ করেছে। দেশের বৃহত্তম প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ কর্তৃক সহিংসতা সংক্রান্ত প্রকাশিত বই পুস্তক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন তথ্যচিত্র কমিশনের সহায়তার জন্য প্রেরণ করা হয়।

২০০১ সনে মানবতা বিরোধী অপরাধ শিরোনামে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে উত্থাপিত ও প্রকাশিত সহিংসতা ঘটনাসমূহ সম্পর্কিত প্রতিবেদন কমিশন নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছে।

২। **নির্বাচন পরবর্ত্তী সহিংসতার সময়সীমা নির্ধারণ ঃ**

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী সহিংস ঘটনা সমূহের বিচার বিভাগীয় তদন্তের উদ্দেশ্য গঠিত এ কমিশনের সম্মুখে সর্ব প্রথম বিবেচনার বিষয় ছিল '' নির্বাচন পরবর্ত্তী'' শব্দের সম্ভাব্য সংজ্ঞা নির্ধারন। W.P. ৭৪৯/০৯ নং মোকদ্দমার পিটিশন এবং প্রার্থনার কলামে ''Immediate after Election'' উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায় আক্ষরিক অর্থে নির্বাচনের পর মূহুর্ত বা নির্বাচনের শেষে তৎক্ষনাত সময়কে বোঝায়। মহামান্য হাইকোর্টে রীট মোকদ্দমার শুনানীকালে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মনজিল মোরশেদ ৩ অক্টোবর ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখ পর্যন্ত পৈশাচিক ঘটনাবলীর প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন মর্মে রায়ে উল্লেখ আছে। রীট পিটিশনে আদালতের বিবেচনার জন্য ২০০১ সনের নির্বাচন পরবর্ত্তী ও ২০০২ সনের জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।

সিভিল সোসাইটি অর্থ্যাৎ সচেতন নাগরিক সমাজ এর উদ্যোগে ''মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'' শিরোনামে জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ১৪-১৫ ফ্রেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে। তথায় ১ অক্টোবর ২০০১ তারিখের পর হতে কনভেনশনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগঠিত সহিংসতার চিত্র উপস্থাপন করা হয়। নির্বাচন পরবর্ত্তী রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনার উপর গবেষণা পরিচালনার জন্য সেচ্ছাসেবী সংস্থা ''ব্রাক'' (BRAC) একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। সমগ্র বাংলাদেশের গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন ''ব্রাকের'' রিসার্চ কো-অডিনেটর ডঃ মোহম্মদ রফি। গবেষণা পরবর্ত্তী প্রকাশিত ''সম্প্রীতির সম্ভাবনা'' নামীয় পুস্তকে তিনি স্পষ্টতঃই উল্লেখ করেছেন যে ১ অক্টোবর নির্বাচনের পর থেকে ৬ (ছয়) মাস সময়ে সারা দেশে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত ছিল। অত্র কমিশন তাদের সামর্থ, জনবল, বেঁধে দেওয়া মেয়াদসহ উপরোক্ত তথ্যসমূহ গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছে। সামগ্রিক আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষতার স্বার্থে নির্বাচন পরবর্তী সময় হিসেবে ১ অক্টোবর ২০০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখ অর্থাৎ নির্বাচনের পর ০১ বৎসর ০৩ (তিন) মাস সময়কে অত্র কমিশন নির্বাচন পরবর্ত্তী সময় হিসেবে বিবেচনায় নেওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশনের উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে মত বিনিময়কালে সকলেই সমর্থন করেছেন।

৩। **সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন, প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ও অভিযোগ যাচাই, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়ার সূচনা ঃ**

কমিশনের গণবিজ্ঞপ্তি দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারের ফলশ্রুতিতে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিগণ কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে এবং ডাকযোগে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। প্রাপ্ত অভিযোগ, তথ্য-উপাত্ত, প্রতিবেদনসমূহ সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। অতঃপর অধিকতর তথ্য সংগ্রহ ও ব্যাপক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা এবং গ্রামাঞ্চল সরেজমিন পরিদর্শন করে ভিকটিমদের সাক্ষ্যগ্রহণসহ অভিযোগ গ্রহণ ও প্রাপ্ত সকল অভিযোগের ভিত্তিতে সহিংসতার ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে সত্যতা নিরূপণ করা হয়। যে সকল অভিযোগে ঘটনার বিবরণ অস্পষ্ট এবং দায়ী ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করা হয় নাই ঐ সকল অভিযোগ কমিশন বিবেচনায় নিতে পারে নাই। তাছাড়া বংশক্রমে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ থাকা সিভিল প্রকৃতির অভিযোগও তদন্তের আওতার বাহিরে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগসমূহের দুইটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

১। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ০১ অক্টোবর/০১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সময়ে অর্থ্যাৎ ০১ বৎসর ০৩ (তিন) মাস সংঘঠিত সহিংস ঘটনা।

২। ১ জানুয়ারী/২০০৩ তারিখ হতে পরবর্ত্তী সময়ে সংঘটিত সহিংস ঘটনাঃ

প্রথম তালিকা অনুযায়ী অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালিত হলেও দ্বিতীয় তালিকাটি কমিশন নিবন্ধিত করে রেখেছে। জাতীয় পত্রিকা বিভিন্ন পুস্তক, রাজনৈতিক দল, সেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকেও তথ্যাদি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতঃ সংঘটিত সহিংসতার সত্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কমিশন স্থানীয়

প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, আইনজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদের অভিজ্ঞতা, সুপারিশ ও মতামত গ্রহণ করে। তাদের সুপারিশ ও মতামত এবং সহিংস ঘটনা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা তদন্ত কাজে সহায়ক হয়েছে।

কমিশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ভিকটিম নারী পুরুষ নির্বিশেষে অভিযোগ দায়েরের প্রশ্নে ছিলেন চরম আতঙ্কিত। ভয়ভীতি ও হুমকি সবসময় তাদের তাড়া করেছে। অধিকাংশ অভিযোগকারী প্রকাশ্যে কমিশনের নিকট আর্থিক সাহায্য দাবী করেন। অনেকে প্রত্যাশা করেন যে নির্যাতনের ফলে শারীরিক, মানসিক ও সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সরকার গঠিত এই তদন্ত কমিশনের বরাবর অভিযোগ দায়ের করলে পরবর্তীতে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার পথ সুগম হবে। এইরূপ মানসিক অবস্থার কারণে অধিকাংশ নির্যাতিত ব্যক্তিগণ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় শুধু অভিযোগ দায়ের করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করে বা আসামীদের চিহ্নিত করতে তারা অপারগতা প্রকাশ করেন বা কখনও নীরব থেকেছেন।

মাঠপর্যায়ে পরিদর্শনকালে ভিকটিমদের ও সমাগত সাধারন মানুষের বক্তব্য/মতামত পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, সহিংস নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্বেও যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কমিশনের কাছে অভিযোগ দাখিল করেন নাই বা অভিযোগ দাখিল করলেও সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করতে চাননি- তার কারণ নিম্নরূপ ঃ

১। -দীর্ঘ ৯ বছর পর অভিযোগ করে কোন লাভ হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন, মনে সংশয়;

২। নিরাপত্তার অভাব। অভিযোগ দাখিল এবং তা প্রকাশ হলে পুনরায় নির্যাতন শুরু হবার সম্ভাবনা।

৩। ধর্ষিতাদের ক্ষেত্রে সামাজিক লোক লজ্জা এবং ভয়। তাই অভিযোগ করা থেকে বিরত থেকেছে, অনেকের বিয়ে হয়েছে- সংসার জীবনে সুখী আছে। সংসারে বিরূপ প্রভাবের শঙ্কা। অনেকের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ এখন নেই। অনেকের কমিশনের কাছে আশার সাহস ছিলনা। অনেকেই সামান্য সামর্থটুকু হারিয়ে ফেলেছে।

৪। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূলে না থাকার আশঙ্কা। অনেকেই মনে করেন রাজনৈতিক কোন পরিবর্তন হলে তাদের উপর পুনরায় নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসবে।

৫। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অধিকাংশই অনেক প্রভাবশালী। এদর অনেকেই আবার রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের নিজেদের অবস্থান/ আদর্শ পরিবর্তন করে ক্ষমতাশীন দলের আশ্রয়ে চলে আসে। এই রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির কারণে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনেকের অভিযোগ করার কোন সাহস নেই।

৬। প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি এবং সর্বশান্ত হওয়ার আশঙ্কা।

৭। দারিদ্রতা। অনেক ক্ষতিগ্রস্ত/নির্যাতিত ব্যক্তিরাই ঘরবাড়ী সম্পদ হারিয়ে এখন নিঃস্ব, চরম দারিদ্রতায় মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছে। এদের অনেকেরই সাহস/সামর্থ নেই। সংখ্যালঘু ও নির্যাতিত ব্যক্তিদের অধিকাংশের বসবাস গ্রামগঞ্জে। তাদের পক্ষে ঢাকায় কিংবা জেলা সদরে এসে অভিযোগ দাখিল বা সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় অভিযোগে বর্ণিত সহিংস ঘটনার সত্যতা নিরূপণ ও সঠিক চিত্র পাওয়া অসম্ভব কষ্টসাধ্য ছিল। বিদ্যমান উক্তরূপ বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহকে শ্রেণী বিন্যাস করে পৃথক তালিকা যাচাই-বাছাই ও সত্যতা নিরূপণ এবং দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে কমিশনের তীক্ষ্ণ নজরদারী ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশের (বিশেষ শাখা) এবং স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়। পুলিশের বিশেষ শাখার গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং থানার পুলিশ ইন্সপেক্টরগণ তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থান করে অনুসন্ধান/তদন্তপূর্বক প্রতিটি অভিযোগের সারবস্তু সম্পর্কে পৃথক পৃথক মতামত দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কমিশনে সংযুক্ত গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে গিয়ে স্থানীয় জনগণের বক্তব্য শ্রবণ করে অভিযোগের সত্যতা যাচাই-পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। হাজার হাজার অভিযোগ ও সহিংসতার ব্যাপকতার কারণে এইরূপ সহায়তা কমিশনের জন্য অপরিহার্য ছিল। Commissions of Inquiry Act 1956 (Act vi of 1956) এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক তদন্তের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী প্রতিটি সহিংস ঘটনায় জড়িত ও দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে।

অত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গতানুগতিক ধারায় গঠিত তদন্ত কমিশন নয়। বাংলাদেশে শুধু নয় বরং উপমহাদেশের সুদীর্ঘ অতীতের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, নির্দিষ্ট যে কোন একটি স্পর্শকাতর জনগুরুত্বসম্পন্ন ঘটনার জন্য সাধারণত একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিশনের বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে একটি ঘটনাস্থলে সংঘটিত একটি মাত্র ঘটনা। একটি মাত্র ঘটনা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাধারণত ১-৬ মাস সময় নেওয়ার ও নজির রয়েছে।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী সংগঠিত সহিংস ঘটনার সংখ্যা হাজার হাজার। ঘটনাস্থল সমগ্র বাংলাদেশ। প্রতিটি সহিংস ঘটনার ভিকটিম একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার। তাদের শরীর ও সম্পত্তি সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু। সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় উপজেলায় ঘটনাস্থলে সংঘঠিত হাজার হাজার সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য একটি মাত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দৃষ্টান্ত বিরল। বাস্তবতার নিরীখে এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে ব্যতিক্রমধর্মী কমিশন হিসেবে আখ্যায়িত করতে কোন সংশয় থাকার কথা নয়। নির্বাচনোত্তর ব্যাপক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে প্রতিটি জেলায় ন্যূনতম ১(এক) মাস সময় নিরন্তর তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হলে ৯ (নয়) বৎসর পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশে সংঘটিত সহিংস ঘটনায় নির্যাতিতদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের জন্য উৎসাহিত করতে পারলে সহিংসতার পূর্ণ চিত্র সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। প্রায় ৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদী এই কার্যক্রমকে বস্তুত ১১ (এগার) মাসের মধে সম্পন্ন করা কি সম্ভব? জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন অসম্ভবকে সম্ভব করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে নিরন্তর শ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। কমিশনের প্রাণন্তর প্রচেষ্টা ও স্বউদ্যোগে ব্যপক উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্যাতিতদের মধ্যে সাড়া জাগানো সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় নিরপেক্ষ প্রশাসন, সুশীল সমাজ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আইনজীবী, স্বেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা কমিশনের কার্যক্রমে সহায়ক হয়েছে। কমিশনের প্রত্যাশা দেশের সচেতন নাগরিক তদন্ত কমশিনের সীমাবদ্ধতাকে গভীরভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করবেন। কমিশনের সকল সদস্যগণের আন্তরিক সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষ অবস্থান বিচার বিভাগীয় তদন্তের ক্ষেত্রে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অত্র কমিশনের কার্যক্রমকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক জগত) উল্লেখযোগ্য প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

২০০১ ইং সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমূহে বহুমাত্রিক অনুসংগ বিদ্যমান ছিল বিধায় প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার প্রাসংগিকতার স্বার্থে বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কর্মপদ্ধতিতে সহিংস ঘটনাসমুহের পটভুমি পর্যালোচনার বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ।

সহিংস ঘটনাসমূহের কারণ ও পটভূমিঃ

রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কি ইতিহাসের নির্মম উত্তরাধিকার নাকি এর সাথে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্র কাঠামোর নির্মাণ উপাদান, শাসক শ্রেণীর অভিপ্রায় ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ জড়িত এরূপ বহু প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

এই উপমহাদেশে যুগে যুগে রাজনৈতিক সহিংসতা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়েছে । রাজনৈতিক সহিংসতার উৎসে সাম্রজ্যবাদ, আধিপত্যবাদী শাসন, শোষণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, স্বকীয়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ ক্রিয়াশীল ছিল । কিন্ত সমসাময়িক সময়ে সাম্প্রদায়িকতা ভিন্ন আংগিকে প্রকটরূপে বিদ্যমান থাকলেও অন্য সকল উপাদানসমূহের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সুদীর্ঘ অতীত থেকে এই অঞ্চলে রাজনীতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতিগোষ্ঠী ক্রমবিবর্তমান অর্থাৎ পরিবর্তীত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা বিশেষভাবে স্থান পায় ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চরিত্র ও প্রকৃতি । উপরোক্ত দৃষ্টিকোন থেকে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংস ঘটনাসমুহের মৌলিক চরিত্রগত ভিন্নতার কারণে ক্রমবিবর্তমান রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন ।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতিতে দ্বিজাতিতত্ত্বেরভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশের বিভক্তি এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্মের মধ্যে দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত হয় । পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অংশ হল । পাকিস্তানের ১ম সংবিধান ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হয় । ভারত বর্ষের বিভাজনের পরে পাকিস্তানের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যকার সম্পর্ক উন্নত না হয়ে হিন্দু -মুসলমানের তিক্ত সম্পর্কে স্মৃতি পুর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্থায়ী ছিল

পাকিস্তানের সংবিধানে স্পষ্টতই উল্লেখ ছিল যে, দেশটি ইসলামীনীতি আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে কারণ দেশটি মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তখনকার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই ধারণা তৎসময়ে অমূলক ছিল না। পাকিস্তানের সংবিধানের এই মৌলিক চরিত্রের কারণে হিন্দু , বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় নিজেদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় সম অধিকার বঞ্চিত নাগরিক হিসাবে গণ্য করতেন ।

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ তার নাগরিকদের একটি অংশের প্রতি বৈষম্য করে ধর্মেরভিত্তিতে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। প্রকৃতিগতভাবে এটা ছিল গণতন্ত্র বিরোধী এবং সংখ্যালঘুদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সৃষ্টি । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি ভাল অবস্থান সম্ভাবনা দেখা দেয় যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের অধিকারের দাবী নিয়ে অগ্রসর হল। পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলায় বসবাস করলেও ভাষা, সাহিত্য,

সংস্কৃতি ব্যবসা বাণিজ্য সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল চরম উপেক্ষিত ও বঞ্চিত । রাষ্ট্রীয় প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রে এই অঞ্চল ছিল প্রকট বৈষম্যের শিকার। দীর্ঘ সময়ের বঞ্চনা , লাঞ্চনা ও সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য মূলক আচরণের বিপক্ষে তারা অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের স্বকীয়তা -স্বাতন্ত্রে সোচ্চার হয়ে অধিকারের দাবী নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষাকে কেন্দ্র করে একটি আন্দোলন গড়ে উঠে। রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন প্রথমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে নিয়মিত রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের নূতন যুগের সূচনা করে ।

যেহেতু বাঙালিদের এই আন্দোলনটি ধর্মের উপর ভিত্তি করে ছিল না এবং ভাষা থেকে শক্তি আহরণ করে ছিল তাই বলা যায় বাঙালি মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এটাই ছিল প্রথম অসাম্প্রদায়িক লড়াই । আন্দোলন যতই অগ্রসর এবং শক্তিশালী হতে থাকে বাংলাদেশের আঞ্চলিক এবং ভাষাগত পরিচয় ততই উন্মোচিত হতে থাকে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সংগঠিত হতে থাকে । স্বাধীনতা সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের উপর দমন নিপীড়ন জেল জুলুম অর্থাৎ রাজনৈতিক সহিংসতা চরম আকারে ধারণ করে। অবশেষে জনগণের এই দীর্ঘ সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় সংখ্যালঘুদের অবস্থা বিশেষ করে হিন্দুদের অবস্থা মারাত্মক রকমের নাজুক হয়ে পড়ে । পাকিস্তানী সামরিক জান্তা মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর মারাত্মক আঘাত হানে । এই অঞ্চলে বাঙালিদের সংখ্যা হ্রাস করার লক্ষ্যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালায় অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করে । মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সমর্থন করেছিল এবং সংখ্যালঘুদের দুঃখ কষ্টের প্রতি তাদের সহানুভূতি ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের জীবনের ঝুঁকির মুখেও তারা সংখ্যা লঘুদের রক্ষা করেছে । অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্মৃদ্ধ মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী জান্তা পরাজিত হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের। বীরমুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয় পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ , গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলনীতি হিসাবে ভিত্তি করে ১৯৭২ সনের সংবিধান রচিত হওয়ায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা মৌলিক চার নীতির অন্যতম নীতি হওয়ায় বাংলাদেশে চমৎকার এক উজ্জ্বল অসম্প্রদায়িক ইতিহাসের সূচনা হল। বস্তুত এটা ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তির জন্য বড় অর্জন, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা অনন্য ছিল । ধারণা করা হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগে সংগে সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু ঘটল।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যতদিন জীবিত ছিলেন সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা টিকে ছিল। **১৯৭৫** সালের **১৫ই** আগস্ট ইতিহাসের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন জাতির জনক বঙ্গঁবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামানকে কারা অভ্যান্তরে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়। **১৯৭১** সালের পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় জাতির জনক বঙ্গঁবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে। এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পর এ দেশ প্রগতিরধারার পরিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ধারায় আবর্তিত হতে থাকে। অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মুস্তাক আহমেদ **১৯৭৫** সালে ঘোষণা করলেন যে বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার কোন স্থান নেই এবং দেশ পরিচালিত হবে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে। মুস্তাকের এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

মুস্তাক শাসনের পরে তৎকালীন সেনানায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন । বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কে মূলনীতি হিসাবে গণ্য করে তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয় । রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তব্য হতে এই ধারণা করা যায় যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভাষা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে নয় বরং ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসই হচ্ছে এই ধরনের জাতীয়তাবাদের মূল কথা । বাংলার মানুষ জাতিগতভাবে বাঙালি হিসাবেই পরিচিত ছিল কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তাদের বাংলাদেশী হিসাবেই পরিচিত হতে হচ্ছে। এই ভাবে তিনি বাংলাদেশের বাঙালি তথা বাংলাদেশের মুসলিম বাঙালি এবং পশ্চিম বংগের বাঙালি তথা পশ্চিম বংগের হিন্দু বাঙালির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনে দিলেন। যদিও এটা অত্যন্ত সুবিদিত যে বাংলাদেশের এবং পশ্চিম বংগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ রয়েছে যারা ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান এবং হিন্দু। জাতীয়তাবাদের এই সজ্ঞার পরিবর্তন অর্থাৎ বাঙালি থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে প্রান্তিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বাঙালি থেকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পরিকল্পিত পরিবর্তনের একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে অনেকে ধারণা করে থাকেন । বাঙালি জাতীয়তাবাদ শুধু ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে, এর বিপরীতে ''**বাংলাদেশ**'' সর্বপ্রথম সেই এলাকার পরিচয় বহন করে, যে এলাকা বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে এই পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য ছিল না। তৎসময়ে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ''ধর্মনিরপেক্ষতা'' অন্যতম মূলনীতি বাতিল করার ফলে বাংলাদেশের সংবিধান সাম্প্রদায়িক সংবিধানে পরিণত হয়। বাংলাদেশের আরেকটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি **''সমাজতন্ত্র''** পরিবর্তন করে সংবিধানে ''সামাজিক ন্যায় বিচার অর্ন্তভুক্তকরা হয়''। সংবিধানের মৌলিক চরিত্র ধ্বংসকারী এই পরিবর্তনসমূহ ছিল সুপরিকল্পিত এবং সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পরিচিতির মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী দেশী ও বিদেশী শক্তির কাছে জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াস ।

জিয়াউর রহমান হত্যার স্বল্পকাল পরেই অপর সেনা শাসক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রপতি হলেন। তিনি তার পুর্বসূরীর মতই ক্ষমতাসংহত করার লক্ষ্যে উওরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পরিবর্তীত রাষ্ট্রীয় মূল নীতি

সমূহকে আরো অগ্রসর করে নিয়ে গেলেন। এরশাদ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য মৌলবাদী অনুভূতিগুলিকে সর্বাত্মকভাবে জাগরিত করেছেন। তার নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি নামে একটি দল গঠিত হয়, যে দলটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তার পূর্বসূরীর ন্যায় অভিন্ন। ১৯৮৮ সালের ৭ই জুলাই এরশাদ এর শাসনামলে সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই নীতি এবং সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সৃষ্টি হয়।

এরশাদ পতনের পর বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী হন। তার দল বিএনপি এবং তিনি তার প্রয়াত স্বামী জিয়াউর রহমান এর নীতি গুলোই অন্ধেরমত অনুসরণ করেন। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল জামায়েত ইসলামীর সমর্থনে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় জামায়েত ইসলাম ক্ষমতায় অংশীদার হয় । পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তিনি তার প্রয়াত স্বামী জিয়াউর রহমানের ভারত বিরোধী নীতি অনুসরণ করেন । এই নীতি পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর থেকে সাম্প্রদায়িক চেতনা শক্তিশালী হতে থাকে এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি রাজনীতির মূল শ্রোতে পুনর্বাসিত হয় এবং ক্ষমতা ও কতৃত্বের চূড়ান্ত শিখরে তাদের অবস্থান সুসংহত হতে থাকে । ফলে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হয় ভুলুন্ঠিত, যা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করার নামান্তর ।

বর্ণিত রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলবাদী উম্মাদনার বিস্তার ঘটতে থাকে। ইসলামের প্রকৃত চেতনায় নয় বরং বিকৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রগড়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল ঐ গোষ্ঠী। তৎকালীন শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, লেখক সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, আইনজীবীসহ প্রগতিশীল চিন্তাধারার ব্যক্তিদের উপর মাত্রাতিরোক্ত নির্যাতন ও নিপীড়ন এক কলংকজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়।

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার শাসনকালে আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি উন্নয়নের চেষ্টা করা হয় । ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ একক সংখ্যাগড়িষ্ঠতায় জয়লাভ করায় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সুসম্পর্কের অনুকূলে সংবিধান সংশোধনের কোন উপায় এ সরকারের ছিল না । আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার স্বার্থে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্রগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতের সরনার্থী হিসাবে ফিরে যাওয়া চাকমাদের ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করার বিষয়টি বাস্তবায়িত হলেও পার্বত্য চট্রগ্রামে অবস্থানকারী বাঙালিদের দখলে থাকা আদিবাসীদের ভূমি ফেরত দেওয়ার শর্তটি কাঙ্ক্ষিত ভাবে বাস্তবায়িত হয় নাই। ২০০১ সালে নির্বাচনের পূর্বে সংসদে অর্পিত সম্পত্তি আইনকে সংশোধন করে একটি বিল পাশ করা হয় । ঐ

সংশোধনী অবশেষে নীতিগতভাবে সংখ্যালঘুদের ব্যবসা ও সম্পদ ফেরত দেওয়ার পথ সহজতর হয়েছে বলে ধারণা করা যায় । সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী ক্ষমতাসীন দলের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অর্থাৎ মূল ধারায় প্রবর্তন করার সুযোগ ছিল না। যদিও এটা ছিল আওয়ামীলীগের মূল রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনীতির ভিত্তি। ১৯৯৬ -২০০১ সালে পর্যন্ত বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রকট আকারে বিদ্যমান ছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাতেই সকল সম্প্রদায়ের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পেরেছে এবং এই প্রশ্নের কোন বিরোধীতার সম্মুখীন হয় নাই ।

আওয়ামীলীগ সরকারের মেয়াদ পূর্তির পরে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্বার্থে সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী ২০০১ সালের ১৬ই জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। নির্বাচনের অবৈধ উপায় অবলম্বন করার প্রশ্নে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য রয়েছে । ভোট গণনার পুর্বে ভুয়া ব্যালট পেপার দিয়ে বেলট বাক্স পূর্ণ করে , কোন কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে ভোট কেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখা, প্রতিপক্ষদলের ভোট কম করে গণনা করা, ভুয়া কাগজপত্র সৃষ্টি করে মিডিয়াতে ভুল ফলাফল ঘোষণা করাসহ বিভিন্ন উপায়ে ভোট কারচুপি হয় বিধায় জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী জনগণের রায়ের সঠিক প্রতিফলন হয় না । এই অভিজ্ঞতার আলোকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় । অরাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব পরবর্তী সরকার গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান । সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে এই সরকার নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত ব্যতীত শুধু দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যএম পরিচালনা করে থাকে । নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রধান দল বা জোট গুলো প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের নিয়োগ কে সমর্থন করে এই আশা থেকে যে, তারা সরকারের অবস্থান করার সময় নিরপেক্ষ থাকবেন। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার শপথ গ্রহণের পর মূহুর্ত থেকেই এমন একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে যে, পররাষ্ট্রনীতিসহ সরকারের সকল নীতি, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব পালনের অধিকার তাদের রয়েছে । তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজেদের সবচেয়ে সক্রিয় সরকার হিসাবে প্রমাণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল । সরকার গঠনের পরমুহূর্ত থেকেই তাদের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণের ফলে জনমনে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে উৎকণ্ঠা ও হতাশার সৃষ্টি হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিজেদের বৈশিষ্ট্যতা দেখিয়েছে ১৪০০ এর ও বেশি সরকারী কর্মকর্তাদের বদলী করে। প্রধান উপদেষ্ঠা ২০০১ সালের জুলাই মাসের ১৫ তারিখে রাতেই শপথ নেওয়ার পরক্ষণই অশোভনীয় দ্রুততার সাথে ১৩ জন গুরুত্বপূর্ণ সচিব কে বদলী করে এর সূচনা করেছিলেন। সচিবালালয়সহ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ মাঠপর্যায়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচনের কাজে ও আইন শৃংখলার দায়িত্বের সংগে সংযুক্ত ছিলেন তাদের নির্বিচারে বদলী করা হয়। সচিবালয়সহ মাঠ পর্যায়ে সাজানো প্রশাসনের প্রশ্নবিদ্ধ কর্মকাণ্ডে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হয় । তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকাণ্ডে সংবিধানের

মৌলিক চরিত্র ও দর্শনের পরিবর্তনকারী শক্তির নীতি ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও আওয়ামীলীগসহ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের উপর কৌশলগত নির্যাতনের ফলে তারা স্থানীয় পর্যায়ে ভোটের জন্য সুসংগঠিত হতে বাধা প্রাপ্ত হয় । ভীতি ও হুমকির মুখে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আওয়ামীলীগ নেতা ও কর্মী এবং সমর্থক দল ও গোষ্ঠীর নেতা ও কর্মীর অনেক ক্ষেত্রে এলাকা ছাড়তে হয়েছিল, বিধায় নির্বাচনের প্রচার ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে তারা যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। তৎসময়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার অভাব সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করেছে। বস্তুত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ড রাষ্ট্র এবং সমাজ কে অস্থিতিশীল করে তোলে, দেশকে সম্পূর্ণ নৈরাজ্যের মধ্যে রেখে যায় এবং রাজনৈতিক বিভক্তি বৃদ্ধি পায়। নৈরাজ্যের শক্তি সক্রিয় হওয়ায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পিত সহিংসতার সূচনা করা হয়। নির্বাচনকে সামনে রেখে খুন জখম, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ লুণ্ঠনসহ সকল ধরনের অপরাধের কারণে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এবং এই ধারা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে আরো প্রকটরূপে অব্যাহত থাকে।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সহিংসতা সংঘঠিত হয়েছে। নির্যাতনকারীরা প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগ ও মুক্তিযুদ্ধে স্বপক্ষের শক্তিকে ভোট প্রদানের জন্য অভিযোগ করেছে । সহিংসতার মাধ্যমে আওয়ামীলীগের ভোট ব্যাঙ্ক খ্যাত হিন্দু সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বিতাড়িত করে বাঙালির সংখ্যা হ্রাস ও হুমকী এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ভোটদান থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ভোটের ভারসাম্য বিনিষ্ট করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। যখন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নির্যাতন করা হয় তখন সংখ্যালঘু এবং নির্যাতনকারীদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সমর্থনের বিবেচনায় নির্বাচনের আগে যাই থাকুক না কেন সেই সময় অনুপস্থিত ছিল। নির্বাচনোত্তর জয়ী রাজনৈতিক দল অর্থাৎ বি,এন,পি, এর নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সমর্থক সন্ত্রাসীরা প্রশাসনের সহায়তায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের উপর সহিংস আক্রমনের সময় নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার কারণে স্থানীয় পর্যায়ে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের শূন্যতার সৃষ্টি হয় ও প্রতিপক্ষের তুলনায় ক্ষমতার ভারসাম্যে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে আক্রমনকারীরা এই সহিংসতায় বিজিত রাজনৈতিক দল অর্থাৎ আওয়ামীলীগের নিকট স্থানীয় পর্যায়ে কোন বিরোধীতার সম্মুখীন হয় নাই।

অত্র কমিশনের মাঠপর্যায়ে তদন্তকালে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষনে চার প্রকৃতিতে ঐ সকল সন্ত্রাসকে চিহ্নিত করা যায়। সক্রিয়তা ও সম্পত্তির দখল সংক্রান্ত সন্ত্রাস, মানসিক অত্যাচার, শারিরীক নির্যাতন যার চরমরূপ হচ্ছে ধর্ষণ ও হত্যা। দেশ শাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ভোটাধিকার। সাংবিধানিক এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দর্শনগত ভিন্নতার জন্য ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, সম্পত্তির দখল সক্রান্ত সহিংসতার বর্বর পৈশাচিক নগ্নরূপ মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে ম্লান করে দিয়েছিল বলে কমিশনের নিকট প্রতিভাত হয়েছে। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার প্রকটরূপ প্রত্যক্ষ করে শক্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ার অপরাধে জননেতা শেখ ফজলুল করিম

সেলিম, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সাবের হোসেন চৌধুরী, বাহাউদ্দিন নাসিম, কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, মুক্তি চিন্তার অনুসারী লেখক ও সাংবাদিক শাহারিয়ার কবির ও ডঃ মুনতাসির মামুন প্রমুখের গেপ্তার ও রিমাণ্ডে নির্যাতনের বিষয়টি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। নিগৃহীত হয়েছেন বিশিষ্ট নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ও নাট্য ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নুর।

পূর্বের পর্যবেক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল সুপরিকল্পিত সুদূরপ্রসারী ও উদ্দেশ্যমূলক। বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেনাশাসক ও তাদের উত্তরসূরী সরকারে ও দলে চরম ডানপন্থী মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা বিরোধী মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর শুধুমাত্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিলনা বরং তারা ছিল দেশ পরিচালনার নীতি নির্ধারক। ফলশ্রুতিতে বিএনপিসহ বিএনপি জামাত জোটের শাসন আমলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ জনগণের কাঙ্ক্ষিত সংবিধানের মৌলিক চরিত্র বিনষ্ট করে ঐ শক্তি ইসলামের মূল চেতনায় নয় বরং বিবৃতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গড়ার দুঃস্বপ্নে লিপ্ত ছিল। তাদের এই দুঃস্বপ্নকে দ্রুততার সাথে অগ্রসর করার মানসে ঐ অশুভ শক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে ধর্মান্ধ মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির অভাবনীয় পুনরুত্থান এবং জঙ্গীবাদের বিকাশ ঘটে। আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর যোগসূত্র ও মদদে বাংলাদেশ সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটতে থাকে।

হংকং থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক '' ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউর'' ৪ঠা এপ্রিল (২০০২) সংখ্যার বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের তৎপরতা সম্পর্কে '' সন্ত্রাসের রেশম'' গুটি (Concoon of Terror) এবং ''গোলযোগ সৃষ্টির নিদান'' (A recipe for Trouble) শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে জঙ্গীবাদের ভয়াবহ তৎপরতা সম্পর্কে যে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা পরবর্তীতে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল জামায়েত ইসলাম ও তাদের সহযোগী রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে বাঙালি জাতির সংস্কৃতির ঐতিহ্য নববর্ষের উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানে জঙ্গীদের বোমা হামলায় নিহত ও আহত হন অসংখ্য নিরপরাধ বাঙালি। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে বানিয়ার চরগীর্জায় বোমা হামলায় ১০ জন নিহত হন। পরবর্তীতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন সরকারের দল ও জোটের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গী গোষ্ঠীদের অসংখ্যা বোমা হামলায় ক্ষতবিক্ষত হয় আমাদের এই জন্মভূমি। বোমা হামলায় নিহত ও আহত হন বিচারক সোহেল আহম্মদ ও জগন্নাথ পাঁড়ে, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এসএম কিবরিয়া, আওয়ামীলীগ নেতা সিলেটের মেয়র বদরুদ্দিন কামরান চৌধুরী, জননেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সাবেক সংসদ সদস্য জেবুন্নেছা, বাংলাদেশস্থ বৃটিশ কুটনৈতিক আনোয়ার চৌধুরীসহ অসংখ্য আইনজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, কবি, সাহিত্যিক ও সাধারণ নিরীহ মানুষ। সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ঝালকাঠি, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামে বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে হত্যা করা হয় জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা আহসানুল্লাহ মাষ্টার, জননেতা মঞ্জুরুল ইমাম, মমতাজ উদ্দিন ও সাংবাদিক মানিক সাহাকে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ আওয়ামীলীগ কার্যালয়ের সামনে জনসভা চলাকালীন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ আওয়ামীলীগের শীর্ষ

স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে ইতিহাসের ভয়াবহ, নিষ্ঠুর ও জঘন্যতম গ্রেনেড হামলা চালানো হয় গত ২১/০৮/২০০৪ তারিখে। উক্ত হামলায় শেখ হাসিনা প্রাণে বাঁচলেও আওয়ামীলীগ নেত্রী আইভি রহমানসহ ২২ জন নেতা ও কর্মী নিহত হন। আহত হন অসংখ্য নেতা ও কর্মী এবং সাধারণ নিরীহ মানুষ। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জাতীয় চার নেতা হত্যা এবং ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা প্রচেষ্টা যে একই সূত্রে গাঁথা এ বিষয়ে কোন দ্বিধা বা সংশয় নাই। গত ১৭/০৮/২০০৫ ইং তারিখে সমগ্র বাংলাদেশে ৬৪টি জেলায় একই সময় প্রায় ৫০০ টিরও অধিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উক্ত জঙ্গী গোষ্ঠী ইহা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, তাদের নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত এবং শেকড় কত গভীরে গ্রোথিত। সাম্প্রদায়িক জঙ্গী গোষ্ঠী নির্বাহী, বিচার ও সংসদ তথা আধুনিক রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গকে আক্রমণ ও ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে আক্রমন পরিচালনা করে। তাদের মূল লক্ষ্য ধর্ম নিরপেক্ষ প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে হত্যার মাধ্যমে নেতৃত্ব শূন্য করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে নস্যাৎ, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি প্রকট ঘৃনা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপর আঘাত, ধর্মীয় উম্মাদনায় পশ্চাৎপদ নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশেকে পাকিস্তানি ভাবধারায় সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করা।

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা এবং ক্ষমতাশীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলবাদী জঙ্গীদের রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর মধ্যে তত্ত্বগত ভিন্নতা না থাকায় এই আলোচনায় উক্ত সংগঠিত রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের উপেক্ষা করার সংগত কোন কারণ নাই। প্রাসঙ্গিক বিধায় এই অধ্যায়টি অনুল্লিখিত রাখা অনুচিত হবে এবং বিষয়বস্তু পূর্ণতা পাবে না।

২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসী ও সহিংসতার মূলে প্রধানত ক্রিয়াশীল ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দর্শন বিসর্জনকারী নীতি ও আদর্শ। ধর্মীয় উম্মাদনায় মৌলবাদীর উত্থান ও জঙ্গীবাদের বিকাশ প্রক্রিয়া রোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংবিধানে পূর্নপ্রর্বতনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে পরিচিত করার জন্য যে প্রধান রাজনৈতিক দল ও অসাম্প্রদায়িক শক্তি সক্রিয় ভূমিকায় নিরলস প্রচেষ্টারত আছে, সেই রাজনৈতিক দল এবং তাদের স্বপক্ষের শক্তিকে সন্ত্রাসী ও সহিংসতার মাধ্যমে নিমূল এবং বিপর্যস্ত ও দুর্বল করে নিষ্কণ্টক রাষ্ট্র ক্ষমতায় চিরায়িত করার অপচেষ্টাই ছিল এই সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য।

উপরে বর্ণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনশীল ধারায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনিষ্ট হওয়ায় এবং রাজনীতির দর্শনের ক্ষেত্রে মতাদর্শগত তিক্ততা সৃষ্টির কারণে অভিন্ন প্রেক্ষাপটে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা মৌলবাদী চেতনা বিরোধী প্রগতিশীল মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সিক্ত অসম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী এবং সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয়ী বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাসী কর্তৃক সংঘটিত হয়েছিল বিধায় প্রাসংগিকতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করার স্বার্থে উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার অবতারণা অপরিহার্য ছিল। নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনাসমূহের কারণ বর্ণিত আলোচনায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

নির্যাতনের প্রকৃতি (Types) ও বৈশিষ্ট

কমিশন মনে করে ২০০১ সনে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নির্বাচনে বিজয়ী দলের সন্ত্রাসীরা ভিন্ন মতালম্বীদের উপর নির্যাতনের বিভিন্ন পন্থা বেছে নেয়। মূলতঃ যে সব উপায়ে নির্যাতন বা সহিংসতা চালানো হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। **দৈহিক বা শারীরিক নির্যাতন ঃ** যেমনঃ

হত্যা, সাধারণ ও মারাত্মক জখম করা, চড়-থাপ্পড় মারা, নারী নির্যাতন, যৌন পীড়ন, ধর্ষণ ইত্যাদি।

২। **অর্থনৈতিক সহিংসতা বা নির্যাতন ঃ** যেমনঃ

ক) বাড়িঘর, দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ।
খ) সম্পত্তি ও জমিজমা দখল।
গ) ক্ষেতের ফসল/গাছপালা কেটে নেওয়া, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি লুটে নেওয়া, পুকুর ও ঘেরের মাছ ধরে নেওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিষ প্রয়োগে মেরে ফেলা।
ঘ) জোরপূর্বক চাঁদা আদায়।
ঙ) মন্দিরের সম্পত্তি দখল, প্রতিমা ও দেব মূর্তি ভাংচুর।

৩। **মানসিক বা আত্মিক নির্যাতনঃ** যেমনঃ

ক) দেশ ত্যাগ বা নিজ এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন, মৌখিকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাঁদা দাবি, গালিগালাজ, আপত্তিকর শব্দ উচ্চারণ যেমন- হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের "মালাউনের বাচ্চা" বলে গালি দেওয়া, নারীদের প্রতি আপত্তিকর ও অশোভন আচরণ, পূজা মন্ডপ মন্দির অপবিত্রকরণ ইত্যাদি।

ধর্ম পালনে বাধাঃ এই ধরনের নির্যাতন কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সংঘটিত হয়েছে। যে সব গ্রামের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির সংখ্যা বেশি স্বভাবতঃ কারণেই যে সব গ্রামে মন্দির গীর্জার সংখ্যা বেশি। নির্যাতনের পর পূজার এসব স্থান, মূর্তি ও পূজার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপকরণ ধ্বংস করার অভিযোগ পাওয়া গেছে, এছাড়াও উপাসনালয়গুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার ঘটনা বেশি ঘটেছে। বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে বেশি গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক ধর্মীয় সহিংসতায় আক্রান্ত হয়েছে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে এ ধরণের সহিংসতা বেশি ঘটেছে।

চাঁদাবাজি ঃ বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় দেশের প্রায় ১৮০-১৯০ টি উপজেলায় কম-বেশি চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বরিশাল, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন উপজেলায় সবচেয়ে বেশি লোক চাঁদাবাজি শিকার হয়েছেন। কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপর চাঁদাবাজির ঘটনা বেশি ঘটেছে বলে কমিটির তদন্তকালে প্রতীয়মান হয়েছে। ব্রাক (BRAC) পরিচালিত একটি তথ্যানুসন্ধানের পরিসংখ্যান হতে জানা যায় দেশের প্রায় ১৮০০ গ্রাম থেকে তারা চাঁদাবাজির ঘটনার

তথ্য পেয়েছেন এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের ৫০২ টি, খুলনা বিভাগের ৪৯৬ টি, বরিশাল বিভাগের ৪১৭ টি, ঢাকা বিভাগের ২৯২ টি, রাজশাহী বিভাগের ৭৫ টি ও সিলেট বিভাগের ১৮ টি গ্রাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদার দাবি ব্যক্তিগত ও মৌখিকভাবে করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিঠির মাধ্যমেও করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও সর্বহারা পার্টির সদস্যরাও এই অবস্থার সুযোগ নেয়।

সম্পত্তি ধ্বংস/সম্পত্তি লুট/জমিজমা দখল ইত্যাদি ঃ তদন্তকালে জানা গেছে নির্বাচনে পরাজিত দলের নেতা-কর্মী সমর্থকদের সম্পত্তি যেমন লুট করা হয়েছে তেমনি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকান, শিল্প, কৃষিজমি, গবাদিপশু, বাগান ও মাছের ঘের-পুকুর থেকেও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি লুট হয়েছে। লুটপাট করার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে বাড়িঘর, দোকান-পাট, জমিজমা ও লিজ নেওয়া জলাশয় ইত্যাদিও দখল করা হয়। লুটপাট ঘটনা বেশি ঘটেছে খুলনা বিভাগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল, বরিশাল বিভাগের প্রায় পুরোটায় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের দক্ষিণ অঞ্চলে।

লুটতরাজের ঘটনার মতই আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সম্পত্তি ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। তাদের বাড়িতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, শিল্প, কৃষি জমিতে এসব ঘটনা ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরো প্রতিষ্ঠান এবং এর ভেতরের জিনিসপত্র আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছে।

দৈহিক/শারীরিক নির্যাতন ঃ দেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা শুরু হয় প্রধানত নির্বাচনের পর। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুরু হয়ে যায়। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের আতঙ্ক নির্বাচনের পূবেই শুরু হয়। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়া শুরু হলেই ভিন্ন মতাবলম্বিদের উপর নির্যাতন শুরু হয়। জোট সরকারের সন্ত্রাসীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিবারের বিশেষ সদস্য/ সদস্যাদের ব্যাপারে খোজ খবর নিতে থাকে। রাস্তায় তাদের অনুসরণ করা হয়। অথবা ঘোষণা দেওয়া হয় আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য তাদেরকে আক্রমণ করা হবে। সম্ভাব্য হামলার আশংকায় সর্তকর্তা হিসাবে অনেক আওয়ামী লীগ সমর্থক আত্মগোপন করে। কোন কোন পরিবার তাদের অবিবাহিত মেয়েদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেয়। ধর্ষণ ও নির্যাতনের ভয়ে মূলতঃ সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে এটা বেশি হয়েছে। কোন কোন পুরুষ হামলার ভয়ে দিনে বা রাত্রে বাড়ির বাইরে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হামলা পরিকল্পিত ছিল বলে তদন্ত কমিশনের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে হামলাকারী তার শিকার পেয়ে হামলা করেছে। হামলাকারীরা, লোহার রড, রামদা, চাকু, বল্লম, লাঠি, হাতুড়ি ইত্যাদি বেশি ব্যবহার করে। শার্টের কলার ধরে; ঠেলা-ধাক্কা মেরে, চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি, লাথি মরেও অনেককে নির্যাতন করা হয়েছে। শারীরিক নির্যাতনের ফলে অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন এমনকি পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

সন্ত্রাসীরা অনেক ক্ষেত্রে শিশু থেকে শুরু করে বিবাহিত মহিলাদের পর্যন্ত ধর্ষণ ও নির্যাতন করেছে। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। যদিও সামাজিক অবস্থা ও লোক লজ্জার ভয়ে অনেকেই এই নির্যাতনের কথা প্রকাশ করেনি বা আইনের আশ্রয় নেয়নি।

বাসস্থান ত্যাগ করা ঃ

যে সব ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বাসস্থান ত্যাগ করেছেন, প্রায় সবগুলো ঘটনায় তারা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিকে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হয়

এবং অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানো হয। চলে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রবণতা দেখা যায় (ছক-১) ।

বলা হয়, চলে না গেলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদেরকে হত্যা করা হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরাও জানতে পারেননি তাদের প্রিয়জন কোথায় গেছেন। দেশের ভেতর নিকটবর্তী গ্রাম অথবা শহর/নগরে যাওয়ার পাশাপশি কেউ কেউ ভারতের পশ্চিম বঙ্গে চলে যান। যাদের পশ্চিম বঙ্গে

ছক-১ঃ

ছবির মতো একটি গ্রাম হোগলারচক এখানে হিন্দু মুসলমানগণ দীর্ঘদিন ধরে শান্তিতে বসবাস করছিল। কিন্তু গত নির্বাচনের সময় মনে হয়েছে যে, কোন কোন লোক গ্রামের শান্তি বিনষ্ট করতে তৎপর।

দুর্গাপূজার প্রস্তুতির অংশ হিসাবে গ্রামের মন্দিরের উঠোনে কুমোর দুর্গা এবং অন্যান্য মূর্তি তৈরি করছিল। একদিন পার্শ্ববর্তী পাইকগাছা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ মিছিল হোগলার চকে প্রবেশ করে। মিছিলটি নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিজয় উৎসবে মেতে উঠেছিল। মিছিলটি মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ নির্মীয়মান মূর্তিগুলোকে আক্রমণ করে বসে। এই সময় কুমোররা মূর্তি নিয়ে কাছ করছিল। তারা হামলাকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। হামলাকারীরা তাদের কেউ মৌখিকভাবে এবং দৈহিকভাবে আক্রমণ করে। একজনের ওপর গুরুতরভাবে হামলা হয়। মাথায় আঘাতের জন্য তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। হামলাকারীরা তান্ডব করে মন্দিরের বাইরের এবং ভেতরের সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। হামলা করার পর মিছিলটি আবার যথারীতি শুরু হয়। মিছিল যখন একটি হিন্দু এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল কয়েকজন মিছিলকারী ওখানে গাছ থেকে ফল পেড়ে নেয়। গৃহস্বামীদেরকে গালাগাল করে। গ্রামবাসীরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। গ্রামে একটি তদন্ত দল পাঠানো হয়। তদন্ত দল আসছে জানতে পেরে চেয়ারম্যান হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের হুমকি দেয় যে, তারা যেন মন্দিরে আক্রমণ এবং ধ্বংসের সঙ্গে তার জড়িত থাকার অভিযোগ না করে। পুরো ঘটনাটি, বিশেষ করে দুর্গার মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতির ওপর গভীরভাবে আঘাত করে।

অবস্থানঃ গ্রাম-হোগলারচক; ইউনিয়ন-গোরোইখালি; উপজেলা- পাইকগাছা; জেলাখুলনা।

আত্মীয়স্বজন ছিল অবৈধভাবে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে ধরা না পড়ে তারাই ওখানে গিয়েছেন। যারা ভারতে গিয়েছিলেন তারা সীমান্তের কাছাকাছিই ছিলেন যেন সুবিধামত দেশে ফেরা যায়। অল্প কয়েকজন উল্লেখ করেছেন যে, তাদের আত্মীয়দের মধ্যে যারা ভারতে গেছেন তারা আর ফিরবেন না।

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নিজেদের বাসস্থান ত্যাগে বাধ্য করার পেছনে কতগুলো কারণ ছিল ঃ

- সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আওয়ামীলীগের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকে। সে কারণে অনেককেই নির্দেশ দেওয়া হয় যেন ওই দলের পক্ষে ভোট না দেয়। নির্বাচনের পর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি দল সংখ্যা-লঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি আগ্রাসী আচরণ প্রদর্শন করে বিভিন্ন কারণে তাদেরকে হুমকি দিতে থাকে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তারা আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে।
- অনেক ঘটনায় হামলাকারীরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা করবার সময় তাদের অপকর্মের স্বপক্ষে এই বলে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করে যে, আওয়ামী লীগে ভোট দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীদের শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে মুসলমান না হওয়ার জন্যও তাদের শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। তখন পর্যন্তও যেসব সংখ্যালঘু হামলার শিকার হননি, এই সব যুক্তির কারণে তারা ভাবতে বাধ্য হন যে, যেকোন সময় তারাও হামলার শিকার হতে পারেন ফলে তারা কোন নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
- যে সব সংখ্যালঘু নির্বাচনের আগে সক্রিয়ভাবে আওয়ামীলীগের পক্ষে কাজ করেছে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ঝুঁকিটা অনেক বেশি, তারা সেই নির্বাচনের পর নীরবে এলাকা ত্যাগ করে
- যারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন অথবা হামলার প্রয়াসের শিকার হয়েছেন তারা এই ভেবে এলাকা ত্যাগ করে যে, গ্রামে থাকলে তারা যে কোন সময় হামলার শিকার হতে পারে (ছক-২)।
- নির্বাচনের পর কয়েক মাসের মধ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্য বারবার নির্যাতিত হয়। তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, এলাকায় থাকলে তারা আবারও নির্যাতিত হবে। এই কারণে তারা গ্রাম ত্যাগ করে।
- গ্রামের প্রভাবশালীদের বিরাগভাজন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এই ভেবে গ্রাম ত্যাগ করে যে, অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশের সুযোগ নিয়ে প্রভাবশালীরা তাদের ওপর হামলা করতে পারে।
- বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে চাঁদাবাজরা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কাছে দাবী করে যে, তাদেরকে প্রতি মাসে চাঁদা দিতে হবে। যে পরিমাণ চাঁদাদাবী করা হয় তা ছিল তাদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু তারা এই অন্যায় দাবি মেনে নেওয়ার জন্যে প্রস্তুতও ছিল না। চাঁদা দেওয়া অথবা চাঁদা না দেওয়ার জন্যে শাস্তি এড়াবার লক্ষ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও গ্রাম ত্যাগ করে। তারা বিশ্বাস করত যে, সাময়িকভাবে অন্য জায়গায় গিয়ে তারা এই নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবে।
- গ্রামে হামলার ভয়ে অনেক সংখ্যালঘু বৃদ্ধদের ঘরে রেখে বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলারা গ্রাম ত্যাগ করে (ছক-৩)। আশপাশের সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে হামলা দেখে তাদের মধ্যে এই ধারণাটি সৃষ্টি হয়েছিল। পরিবারের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তি চলে যাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারের উপার্জন সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে ফসল নষ্ট হয়, কারণ ফসল তোলার কেউ ছিল না।

- কিছুসংখ্যক সংখ্যালঘু তাদের বাড়িঘর ছেড়ে নির্যাতনের দুঃসহ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। এই দলে বেশ কিছু তরুণী ছিলেন, যাদেরকে ধর্ষণ করা হয়। এই সব ঘটনা তাদের আত্মসম্মান এবং তাদের ব্যক্তি জীবন ও পরিবারের ওপর সংঘাতিকভাবে আঘাত করে। তারা নীরবে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় এবং প্রতিবেশীরা কিছুই জানতে পারেনি।

ছক-২ ঃ
যুগল পাল কুশিয়ায় একটি মুসলমান সংখ্যাগুরু পাড়ায় বাস করতেন। তার দুই পুত্র ঢাকায় এক জীবন বীমা কোম্পানীতে কাজ করত। যুগলের বসতভিটা এবং কৃষি জমির ওপর, গ্রামের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির দৃষ্টি পড়েছিল, তাদের ইচ্ছা ছিল স্বল্প দামে এগুলো কিনে নেয়া অথবা সম্ভব হলে অবৈধভাবে দখল করা। এই উদ্দেশ্য থেকে তারা নানাভাবে যুগলকে হয়রানি করছিল, যেন সে পাড়া ত্যাগ করে।
নির্বাচনের পর এক রাতে গুন্ডাদের একটি দল দরজা ভেঙে যুগলের বাড়িতে ঢুকে তাকে গুরুতরভাবে প্রহার করে। তার স্ত্রী এবং কন্যা পাশের মুসলমান বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে কোন মতে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়। গুন্ডারা যুগলকে হুমকি দেয় যে, পাড়া ছেড়ে না গেলে তাকে হত্যা করা হবে। প্রাণের ভয়ে যুগল গ্রামের ভেতরেই হিন্দু পাড়ায় এক বন্ধুর উঠোনে ছোট্ট ঘর তুলে সেখানে চলে যায়। এই খবর পেয়ে যুগলের দুই পুত্র ছুটে গ্রামে আসে। কিন্তু যে গুন্ডারা তাদের পিতাকে পিটিয়েছিল তারাই দুই পুত্রকে গ্রামে ঢুকতে দেয়নি। দুই ভাইকে গ্রামে ঢুকলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। গুন্ডারা তাদের পাড়ায় যুগলের বাড়ি দখল করে নেয়। যুগল আদালতে মামলা করেছে এবং এর শেষ দেখার ইচ্ছা থাকলেও বিশ্বাস করে যে, সে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

অবস্থান ঃ গ্রাম-বাহিরকুশিয়া; ইউনিয়ন- ঘোড়িশার; উপজেলা- নড়িয়া; জেলা- শরিয়তপুর।

ছক-৩ঃ
২০০১ সালের ০৫ অক্টোবরের রাতে সুনীতি মালাকার এবং তার ১৬ বছর বয়স্কা কন্যা ২০/৩০ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হন। এই ঘটনার পর গ্রামের সকল বয়স্ক মহিলা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে নিরাপত্তার কারণে চলে যান।

- নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মামলা হয়, তাদের অভিযুক্ত করা হয়। চারদলীয় জোটের কর্মীদের আক্রমণ করার জন্য যখন তারা নির্বাচনের আগে ভোটের জন্য প্রচারণা করছিল। অভিযুক্তরা বাড়িঘর ছেড়ে পুলিশের গ্রেফতারের ভয়ে লুকিয়ে থাকে।

এলাকা ত্যাগ করার ধরণ ঃ এলাকা ত্যাগ করার জন্যে সুবিধা অনুযায়ী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নানা রকমের কৌশল গ্রহণ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের শিকার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নীরবে গ্রাম ত্যাগ করেন যাতে গ্রামবাসীরা, এমনকি প্রতিবেশীরাও কিছু জানতে না পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের সকলেই বাড়ি ত্যাগ করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নির্যাতিতরা অথবা যাদের ওপর নির্যাতনের আশঙ্কা রয়েছে শুধু তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। যখন তাদেরকে যেতে বাধ্য করা হয় শুধু তখনই বাড়িতে তালা মেরে পুরো পরিবার এক সাথে চলে যায়। এই পরিবারগুলো তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে যান। এক সাথে স্থান সংকুলান হয় যেখানে তাদের এবং যারা তাদেরকে স্থান দিয়েছে তাদের কোন অসুবিধা না হয় এসব বিষয় তারা বিবেচনা করে। অথবা ভাগে ভাগে বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে তারা অবস্থান করে। এক্ষেত্রে মেয়েদেরকে নিকটতর আত্মীয় এবং নিরাপদ ভাবা হয় এমন পরিবারের কাছে আশ্রয় দেয়া হয়।

আশ্রয়স্থল ঃ সম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার জনগোষ্ঠী আশপাশের গ্রামের আশ্রয় নেন তারা সবসময়ই যে সংখ্যালঘু গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন নয়, যেখানে তারা নিরাপদ বোধ করেন। সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাধারণত এ সকল গ্রামে আত্মীয় স্বজনের ঘরেই আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাবশালী মুসলমানদের ঘরেও যেমন চেয়ারম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া হয়। এইসব মুসলমানগণ নির্যাতিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পরিচিত এবং মানবিক কারণে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যারা আশ্রয় গ্রহণ করেন কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আশ্রিতের গ্রামে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারতেন। অন্যরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাদের অবস্থান আড়াল করে রাখার জন্যে দিনের বেলায় নিজেদেরকে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখতেন। এদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল তারাও ছিলেন। স্থানীয় শহর ও নগরে যারা আশ্রয়গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে তরুণদের প্রাণনাশের হুমকি এবং তরুণী ধর্ষিত হওয়ার ভয় ছিল। এরা আশপাশের গ্রামগুলোকে নিরাপদ মনে করেনি। সে কারণে তারা শহর এলাকায় চলে যান, যেখানে তাদেরকে পরিচিত কেউ চিনিত না। সে কারণে তারা সেখানে নিরাপদ বোধ করে।

যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তাদের আশ্রয়ের সময়ও স্থান এক নয়, এটা নির্ভর করে তাদেরকে নিরাপত্তা এবং বাড়ি থেকে বাইরে থাকার সুযোগের ওপরে (ছক-১) কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে দিনে অথবা রাতে বাড়ির বাইরে থাকতে হয়েছে। যে সময়টাকে তারা তাদের জন্য নিরাপত্তাহীন বলে ভেবেছে। তরুণীরা অনেকেই রাতের বেলায় আশপাশের বিভিন্ন বাড়িতে থেকেছে যেন ধর্ষণকারীরা যেন তাদেরকে খুজে না পায়। অন্যরা কেউ কেউ কিছুদিনের জন্য বাড়ির বাইরে থেকে আবার ফিরে এসেছে, যখন ফিরে আসাটা তাদের জন্য নিরাপদ মনে করেছে। আবার কেউ কেউ মাসের পর মাস বাড়ির বাইরে থেকেছে কারণ তারা নিজেরা বা তাদের পরিবার নিশ্চিত হতে পারেনি। কখন তারা বাড়ি ফিরতে পারবে বা আদৌ ফিরতে পারবে কি-না। নির্যাতিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যখন নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে তখণ বাড়ি ফিরেছে। এটা করা হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে নিরাপত্তা পরখ করে অথবা কোন বিশ্বস্ত সূত্র থেকে নিশ্চিত হয়ে।

নির্যাতনের শিকার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের বর্ণনা, এলাকার বুদ্ধিজীবী সচেতন মানুষের মতামত, বিভিন্ন সংগঠনের অনুসন্ধান প্রতিবেদন ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনায় ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচতন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ফুটে উঠেছে ঃ

- প্রশাসন এই সহিংসতা দমনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে।
- আওয়ামী লীগ সমর্থক বা নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়া ব্যক্তিরা সহিংসতার শিকার হয়েছেন।
- সহিংসতা দমনে ছোটবড়, প্রগতিশীল-রক্ষণশীল সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক দল সংঘবদ্ধ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।
- ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার জনপ্রতিনিধিরা বিশেষ করে বিজয়ী দলের সমর্থক জনপ্রতিনিধিরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সহিংসতা/নির্যাতন দমনে নিষ্ক্রিয় ছিল।
- দুর্দিনে অসহায় নির্যাতিত মানুষগুলোর পাশে দাড়িয়ে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার কোন কার্যকর প্রচেষ্টাও নেয়নি কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক সংগঠন (বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান ছাড়া)।
- মফঃস্বল শহর ও গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত ও অসহায় দরিদ্র মানুষ (স্বল্প আয়ের কৃষক, ভূমিহীন চাষী, দিন মজুর, শ্রমিক, জেলে, ছোট দোকানদার) যারা একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী (আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থক) তারাই নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বেশি শিকার হয়েছে।
- নারী-পুরুষ, বয়স, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর নির্যাতন হয়েছে।
- বয়স, বৈবাহিক অবস্থা নির্বিশেষে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। এক্ষেত্রে (৮/৯) বছরের শিশু থেকে বয়স্ক মহিলারাও যৌন নির্যাতন থেকে রেহাই পাননি।
- সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শহরগুলোতে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা তেমন ঘটেনি।
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ব্যাপকতা লক্ষণীয় তবে যে বিপুল সংখ্যায় সংখ্যালঘু নির্যাতিত হয়েছে সে তুলনায় তাদের নিকট থেকে অভিযোগের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল।

ছক-১

একনজরে ২০০১ নির্বাচনোত্তর সহিংসতার বিবরন (কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত মোট অভিযোগের ভিত্তিতে)

বাংলাদেশ ঃ

বিভাগের নাম	০১/১০/২০০১ হতে ৩১/১২/২০০২	অস্পৃষ্ট/অনির্দিষ্ট/বাতিলকৃত আবেদন	মোট
ঢাকা	২৭৬	১৮২	৪৫৮
চট্টগ্রাম	৪৫৭	১৫৭	৬১৪
রাজশাহী	১৭০	১৮২	৩৫২
খুলনা	৪৭৮	৪১৬	৮৯৪
বরিশাল	২২২৭	৯৯৭	৩২২৪
সিলেট	১৭	১২	২৯
সর্বমোট =	**৩৬২৫**	**১৯৪৬**	**৫৫৭১**

ছক-২

একনজরে ২০০১ নির্বাচনোত্তর সহিংসতার বিবরন (বিবেচনার জন্য গৃহীত ০১/১০/২০০১ হতে ৩১/১২/২০০২)

বাংলাদেশ ঃ

বিভাগের নাম	রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড	ধর্ষণ/গণধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধ	মোট	রুজুকৃত মামলার সংখ্যা		
				মোট মামলা	অভিযোগপত্র	চূড়ান্ত রিপোর্ট
ঢাকা	৯২	১৮৪	২৭৬	৫২	৪৫	০৭
চট্টগ্রাম	৯৭	৩৬০	৪৫৭	৪৯	৪১	০৮
রাজশাহী	৫৩	১১৭	১৭০	৩৭	৩৩	০৪
খুলনা	৭৩	৪০৫	৪৭৮	৪৪	৪০	০৪
বরিশাল	৩৮	২১৮৯	২২২৭	৩৯	৩৫	০৪
সিলেট	০২	১৫	১৭	০০	০০	০০
সর্বমোট =	৩৫৫	৩২৭০	৩৬২৫	২২১	১৯৪	২৭

২০০৩ হতে ২০০৬ সময়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংস ঘটনা

বিভিন্ন পত্রিকা, সংস্থার প্রতিবেদন ও প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৩ হতে ২০০৬ সময়ে দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১৪,৩০০ সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মর্মে কমিশন অবহিত হয়েছে। তবে উক্ত সময়কালের সংঘটিত অপরাধসমূহ অত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের আওতাভুক্ত না হওয়ায় তা তদন্তমুক্ত রাখা হয়েছে।

একনজরে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার লেখচিত্র

একনজরে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার লেখচিত্র

একনজরে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার লেখচিত্র

একনজরে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার লেখচিত্র

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা দেশের বিভন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লেও জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রিপোর্ট, কমিশনের নিকট দাখিলকৃত অভিযোগ ও কমিশনের তদন্তে নিম্নলিখিত বিভাগ/জেলা/থানাসমূহ বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা যে সব বিভাগ/জেলা/থানায় বেশি ঘটেছিল ঃ

(ক) <u>বরিশাল বিভাগ ঃ</u>

(১) ভোলা জেলা ঃ লালমোহন, ভোলা সদর, তজুমদ্দিন, চরফ্যাশন, বোরহান উদ্দিন, দৌলতখান থানা।
(২) বরিশাল জেলা ঃ সদর, গৌরনদী, আগৈলঝড়া, উজিরপুর, বাবুগঞ্জ, বানারীপাড়া থানা।
(৩) পটুয়াখালী জেলা ঃ সদর, দুমকি, মির্জাগঞ্জ ও বাউফল থানা।
(৪) পিরোজপুর জেলা ঃ পিরোজপুর সদর, নাসিরাবাদ, স্বরূপকাঠী ও নাজিরপুর থানা।
(৫) ঝালকাঠী জেলা ঃ নলসিটি, রাজাপুর ও কাঠালিয়া থানা।

(খ) <u>খুলনা বিভাগ ঃ</u>

(১) বাগেরহাট জেলা ঃ সদর, রামপাল, মোল্লাহাট, শ্বরনখোলা ও কচুয়া থানা।
(২) ঝিনাইদহ জেলা ঃ কালিগঞ্জ ও হরিণাকুন্ডু থানা।
(৩) যশোর জেলা ঃ ঝিকরগাছা, চৌগাছা ও কেশবপুর থানা।
(৪) কুষ্টিয়া জেলা ঃ গৌলতপুর থানা।

(গ) <u>চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ</u>

(১) চট্টগ্রাম জেলা ঃ বাঁশখালি, মিরেশ্বরাই, রাউজান, সন্দ্বীপ ও সাতকানিয়া থানা।
(২) ফেনী জেলা ঃ সোনাগাজী ও দাগনভূইয়া থানা।
(৩) কুমিল্লা জেলা ঃ নাঙ্গল কোর্ট ও চৌদ্দগ্রাম থানা।
(৪) খাগড়াছড়ি জেলা ঃ রামগড় থানা।

(ঘ) **রাজশাহী বিভাগ ঃ**

(১) সিরাজগঞ্জ জেলা ঃ সদর, কাজীপুর, উল্লাপাড়া থানা।

(২) পাবনা জেলা ঃ সুজানগর ও চাটমোহর থানা।

(৩) রাজশাহী জেলা ঃ বাঘমারা ও পুঠিয়া থানা।

(৪) নাটোর জেলা ঃ বড়াইগ্রাম ও বাগাতিপাড়া থানা।

মধ্যম পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্থ বিভাগ হচ্ছে ঢাকা বিভাগ, এই বিভাগের ক্ষতিগ্রস্থ জেলাসমূহ হচ্ছে রাজবাড়ী জেলা, গাজীপুর জেলা, কিশোরগঞ্জ জেলা, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলা।

অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মতামত ও সুপারিশ

কমিশনের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রোধে কতিপয় প্রস্তাবনা ও সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি প্রধান ভিত্তি, যার জন্য সবসময় সতর্কাবস্থা কাঙ্ক্ষিত, যা বিস্তৃত এক রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে এবং এক শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমতার ধারণা ধরেই নেয় স্বাধীনতা যেন মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রের সাম্যবাদী সৌভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ তুলে ধরে। আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠির স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক সুবিধা অথবা ভোটাধিকার না দেওয়ার বিষয়গুলি কোন দূরের ঘটনা নয়। আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্বীকৃতি দেখেছি। ইতিহাসের সাক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গনে সমান সুযোগ এবং সমতার মূল্যবোধ সংরক্ষিত না হলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রায়শই প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বেদনাদায়ক প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়।

গণতন্ত্র শাসনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলেও একে সংস্কৃতি হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে, বিশেষ করে সহনশীলতার সংস্কৃতি হিসেবে। যে ভারসাম্যমূলক আদর্শ বা মান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও চর্চাকে রক্ষা করে সেগুলো অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহনশীলতা এবং মত প্রকাশের সমান সুযোগের গুরুত্বপূর্ণ মানবিক মূল্যবোধগুলো দিয়ে উপস্থাপিত হয়। ২০০১ সনের নির্বাচনোত্তর সহিংসতায়, যে সহিংসতা ভিন্ন রাজনৈতিক মতালম্বী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নির্যাতিত হয়েছে এবং অনেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার হুমকি আমাদের বাস্তব বাসভূমিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সরকার, শাসক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার কাঠামোও পরিবর্তিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে বাংলায় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক বিভিন্ন রকমের সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন জীবন এবং স্বাধীনতা দুটোই ছিল হুমকির মধ্যে তখন দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার জন্য সহিংসতা এবং কোন কোন এলাকায় হুমকির মুখে তাদের সম্পত্তি দখল তথাকথিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতি উপহাস স্বরূপ। স্বাধীনতার স্বল্পকাল পর থেকে বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক সাধারণ বিবরণ রাজনৈতিক সংগঠনে বা প্রশাসনে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শাসনে ঝুকে পড়ার সাক্ষ্য দেয়, একই সঙ্গে সহনশীলতা, সহবস্থান এবং মতপার্থক্য গ্রহণ করার মতো গণতান্ত্রিক বোধগুলিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার সাক্ষ্য দেয়।

অভিজ্ঞতায় এই প্রবনতাই লক্ষ্য করা যায় যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনেতিক সুযোগে বৈষম্য যত বেশী হয় গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সামাজিক দূরত্বও তত বৃদ্ধি পায়। **উচ্চতর সামাজিক মূল্যবোধ চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ ও ক্ষমতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে না, যা একে অপরকে বোঝা এবং একসাথে থাকার মধ্য দিয়ে মানবতাকে সমৃদ্ধ করে।** দায়টি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়েরই, কিন্তু সংখ্যাগুরুকে দায়ভারটি নিতে হবে। আমরা সেই শাসন প্রত্যাশা করি, যে শাসন ন্যায়নুগ শাসন বৃদ্ধির শুধুমাত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকে নয় আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে সভ্যতা এবং মানবিক মূল্যবোধের সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে যা আমাদের সকলকেই সমৃদ্ধ করবে।

আমাদের দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চার চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনাও মূল্যবোধের প্রশ্নে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সুদৃঢ় ঐক্যমত্য এবং সহ অবস্থান প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে কোন পদস্খলন বা নেতিবাচক আদর্শ জাতি আবশ্যিক ভাবে প্রত্যাখান করবে।

রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনৈতিক আদর্শ ও দর্শন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গৃহীত কর্মপদ্ধতি, দেশের নাগরিক তথা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিকিকরণ ও সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়গুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত, রাজনৈতিক সাংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। দেশের জনগণ ঐ সকল উপাদান ও উপকরণসমূহ বিবেচনা করে গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। ভোটাধিকারের প্রয়োগের জন্য রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা গনতন্ত্রের মসৃন যাত্রাপথে অন্তরায় সৃষ্টি করে ও অগণতান্ত্রিক অশুভ শক্তির উত্থানে উৎসাহ যোগায়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক অপরিহার্য। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির অটুট ঐক্য বজায় রেখে বিপক্ষের শক্তিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বিপক্ষ শক্তির তৎপরতা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে সচেতন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের সাথে সাথে **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি** বজায় রাখার উদ্দ্যোগ বাঞ্ছনীয়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং সরকার ধৈর্য ও সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করবে, পাশাপাশি বিরোধী দলের গঠনমূলক সমালোচনাকে উৎসাহিত করবে। বিরোধী দল হিংসা ও বিদ্বেষের পথ পরিহার করে সংসদে আইন প্রণয়নে ও সরকারের সকল নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনার মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করলে সংসদ আক্ষরিক অর্থে কার্যকর করা সম্ভব পর হতে পারে। মিথ্যাচার ও রাজনীতি বিবর্জিত কর্মকান্ডকে সযত্নে পরিহার করলে গণতন্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাবে এবং সহনশীলতা ও পারস্পরিক আস্থারোধের দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার নেতৃত্বে সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ। এই স্বীকৃত সত্যের অস্বীকৃতি বা কোন বিতর্কের অবতারণা ইতিহাসের বিকৃতি ও হীনমন্যতার পরিচায়ক শুধু নয় বরং তা লাখো শহীদের আত্মাকে আলোড়িত করে। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তাঁর দল আওয়ামীলীগসহ বাঙালি জাতি ১৫ই আগস্ট ব্যথিত হৃদয়ের সঙ্গে শোক দিবস পালন করে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত বা রাজনৈতিক আক্রোশের বশবর্তী হয়ে একটি রাজনৈতিক দল এবং দলের শীর্ষ নেত্রী শোক দিবসে উল্লাস প্রকাশসহ মহা আনন্দে জন্মদিন পালন করে আসছে। এই বিপরীতমুখী রাজনৈতিক বাস্তবতা জাতি অত্যান্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে প্রত্যক্ষ করছে।

জাতির পিতা হিসাবে কোটি কোটি বাঙ্গালির হৃদয়ের গভীরে গ্রোথিত আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতীর প্রত্যাশা এই মুহূর্তে বিষয়টির সংবিধানে অর্ন্তভূক্তি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং শোক দিবসে সযত্নে আনন্দ উল্লাস পরিহার করে কোটি কোটি বাঙালির ব্যথিত হৃদয়ের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে একাত্মতা প্রকাশ করার মানসিকতা গড়ে উঠলে এবং আচরণে তা প্রকাশ করলে উত্তপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে সুবাতাস বয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আশা করা যায়।

সমাজের বুনট আর সৌহার্দ্যের সুরটি অক্ষুর্ণ রাখতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। ধর্মের ও একটি মৌলিক অবদান হচ্ছে সমাজে ঐক্যমত্য সৃষ্টি করা। ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তা, অভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিচিতি, প্রায়ই একই ধরণের সাংস্কৃতিক চর্চা, ভাষা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের অংশগ্রহণ আমাদের একই পতাকাতলে সমবেত করার ইতিহাস খুব দূরের ঘটনা নয়। ভবিষ্যত বাংলাদেশ গঠনে সকল মত, পথ, ধর্ম ও জাতির মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। সবার মতামতের ও অধিকারের গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকৃত ও সঠিক সংজ্ঞায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সম্পত্তি সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যার্পন) আইনের অনুমোদন এবং খ্রিস্টিয় সম্প্রদায় তাদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ''ষ্টার সানডে'' উপলক্ষে সরকারি ছুটির বিষয়টি ইতিবাচক দৃষ্টিতে বিবেচনা প্রত্যাশা করে।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সহিংস এবং শান্তিপূর্ন উভয় ধরণের সম্পর্কই দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। ইসলাম অন্য ধর্মের জন্য হৃদয়ে শ্রদ্ধা এবং সহনশীলতা গ্রোথিত করে। মুসলিম বিশ্বাস অন্য ধর্ম বিশ্বাসের সকল অনুসারীদের প্রতি সহনশীলতা এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নির্দেশ করে। অর্থ্যাৎ স্বধর্ম ও অন্য ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পরিবর্তনের পারস্পরিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়ক। শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন ছাত্রদের মধ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে।

ধর্মরিপেক্ষ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে এবং বাংলাদেশকে এই সংস্কৃতি ও মানুষের বহুত্ব মেনে নিতে হবে। সঠিক সচেনতা, মানবতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের বিশ্বাস ও আচরণের প্রতি স্বীকৃতি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সহিংসতা রোধে কাজ করে।

ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ধর্মের সঙ্গে বিরোধ করে না বরং একই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আচার আচরণে অনুমোদন করে। এরূপ ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদেরই প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি বহু দলীয় দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয়। কাজেই বাংলাদেশের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি অনুসৃত হওয়াই কাম্য।

সমাজের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সামাজিক বন্ধন যত শক্তিশালী হবে যৌথভাবে পরস্পরকে আঘাত করার সম্ভবনাও তত হ্রাস পাবে। ধর্মীয় সম্পদায়গুলোর মধ্যে সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী হতে হবে।

লিঙ্গ, ধর্ম বর্ণ ভাষাসহ কোন ভিত্তিতেই দেশের নাগরিকদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিধান সংবিধানে রয়েছে। নাগরিকদের প্রতি কোন ধরণের বৈষম্য আইনের শাসনের পরিপন্থী এবং এর বিলোপ অপরিহার্য। আদিবাসীদের জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় অধিকতর সম্পৃক্ত করতে শিক্ষা গ্রহণে তাদের অধিকতর আগ্রহী করে তুলতে হবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুমুখী ভাষা রয়েছে। মাতৃভাষা হিসাবে ঐসব ভাষা চর্চার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করে পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান সমীচীন হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ও ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাসমূহ

বিলোপ করে শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ভূমি বিরোধের নিষ্পত্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসকারী জনগোষ্ঠী কামনা করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুসিত অঞ্চল বিধায় ঐ এলাকার বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ ও প্রচার, সর্বজনীন সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের প্রশাসনিক ও রাজনীতিকে সক্রিয় অবস্থানে রাখা, ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যসূচী আধুনিকায়ন ও মূল ধারার সঙ্গে সমন্নয়করণ, বিভিন্ন ধর্ম অনুসারীদের মধ্যে পারস্পারিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ উৎসবে শান্তি পূর্ণভাবে পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীণতার চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষনীয় পর্যায়ে উন্নতি ঘটবে। বাংলাদেশের সংবিধানের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের পরিবর্তে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ সংবিধানে পরিণত করা সম্ভব হলে মৌলবাদী শক্তির উত্থান ও জঙ্গীবাদের বিকাশ রোধসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট করার দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রতিবন্ধকতা সমূহ রোধ করা সম্ভব। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ৫ম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার রায় মূলে সংবিধান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ফিরে আসলেও এই চেতনাকে শানিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোন থেকে যদি মূল্যায়ন করা যায় তবে এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে স্বল্প মেয়াদে সরকার পরিচালনা ও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে হতাশা ও শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা হয়। গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তি। অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জনগণের নিকট কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় এবং গণতন্ত্র আমাদের সংবিধানের Fundamental Princple of state Policy হওয়ার কারণে এই সরকার পদ্ধতি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিকও বটে। কেননা এই পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় এক ব্যক্তির শাসনে পরিণত হওয়ার সম্ভবনা বা সুযোগ বিদ্যমান আছে। অতীতে সামরিক শাসকদের অগণতান্ত্রিক আচরণে দেশ যখন মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন তখন বিরাজমান পরিস্থিতিতে আশু করণীয় গণ্যে নির্বাসিত গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে Doctrine of neccesity এর নীতিতে সমসাময়িক সময়ে এই পদ্ধতির সরকার প্রর্বতন করা হয়। ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার সমূহের কর্মকান্ড সম্পর্কে জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পূর্ববর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মকান্ডে যে গুরুতর বিতর্কের সৃষ্টি হয় ঠিক অনুরূপ উদ্দেশ্যে ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা নেওয়ার কারনে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল তা সমগ্র দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। এক শীর্ষ ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই তখন মূখ্য হয়ে পড়েছিল, যাহা স্বৈরতান্ত্রিক মনো্ভাবের পরিচায়ক।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাথে সাথে গুরুত্বপর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ গণহারে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনে রদবদল করার দৃষ্টান্ত আছে। অধিকাংশ জেলা প্রশাসনে ও পুলিশ প্রশাসনে অনভিজ্ঞদের পদায়নের ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। এই দুর্বল প্রশাসনের কারনে নৈরাজ্যের শক্তির উত্থান ঘটে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এই কর্মকর্তাগণ ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত

পেয়ে সম্ভাব্য ক্ষমতাসীনদের আনুকুল্য পেতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করায় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রোধে কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না। এদের নিষ্ক্রিয়তা ও ক্ষেত্র বিশেষে পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হয়ে জটিল পরিস্থিতিতে সহিংস আক্রমন চালায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এটা একটি নেতিবাচক দিক।

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষায় অন্তরায় সৃষ্টিকারী বিধানের কারণে স্বল্পকালীন সরকারের অনির্বাচিত নীতিনির্ধারকগণ নিজেদেরকে জাতীয় ত্রাণকর্তা হিসাবে উপস্থাপন করায় গণতন্ত্র হয়েছে অপমানিত। উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা না থাকায় আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক এক্ষেত্রে মূখ্য হয়ে যায়। ফলে গ্রহণযোগ্যতা হয়ে পড়ে প্রশ্নের সম্মুখীন।

নির্বাচিত সরকার অর্থ্যাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অব্যহত থাকাকালীন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অনির্বাচিত জবাবদিহিতা বিহীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখা হবে কি হবে না এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে বলে কমিশন মনে করে। সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে সম্পর্ণ স্বাধীন হস্তক্ষেপ মুক্ত স্বনির্ভর নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। উপমহাদেশের ভারতসহ সকল গণতান্ত্রিক দেশের উদাহরণ অনুকরণীয়।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় সুগভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের বিষয়টি সুপ্রমানিত। কোন উদ্দেশ্য বা সুদূর প্রসারী লক্ষ্য না থাকলে স্বাভাবিক এবং সাধারণগত ভাবে জাতীয় নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের কারণে তাৎক্ষনিক উত্তেজনা, হিংসাত্মক মনোভাব, আবেগ ও উত্তাপ বিরাজমান থাকলেও **পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা এবং আন্তরিক সদিচ্ছা থাকলে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা রোধ করা সম্ভব।**

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার নির্মমতার অভিজ্ঞতায় ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সহিংসতা সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি অমূলক ছিল না। কিন্তু জাতি উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কিত হলেও নির্বাচনে বিজয়ী প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বের, মহানুভবতা, সহনশীল আচরণ ও নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বিক্ষুব্ধ নেতা ও কর্মীগণের সংযত আচরণ ও পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব জাতি স্বস্তির সাথে প্রত্যক্ষ করেছে। নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে তথা শীর্ষ নেতৃত্বের প্রজ্ঞা, সহনশীলতা, দুরদর্শিতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ এই উদার দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ও নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা রোধের জন্য জাতি অপরিহার্যরূপে প্রত্যাশা করে।

নির্বাচনোত্তর নির্যাতিত ব্যক্তি ও পরিবারের শরীর ও সম্পত্তি সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু ছিল। খুন, ধর্ষণ, সম্পদ লুণ্ঠন, জোর পূর্বক চাঁদা আদায়, সন্ত্রমহানী, শারীরিক নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, বৈধ সম্পত্তি দখল ও মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী প্রভৃতি উপায়ে সহিংস ঘটনা ঘটেছে। সহিংসতায় শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ অধিকাংশই দরিদ্র এবং নিম্নবিত্ত। সহায় সম্বলহীন এই নিরপরাধ ব্যক্তিগণ আর্থিক সাহায্য পাওয়ার অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে কমিশন বরাবর অভিযোগ দাখিল করেছেন। প্রায় প্রত্যেকে তাদের

অভিযোগে ক্ষতির প্রকৃতিসহ ক্ষতির পরিমান উল্লেখ করেছেন। কমিশন সরেজমিন পরিদর্শনকালে স্বচক্ষে শরীর ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে। তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষতিগ্রস্থ নির্যাতিত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে থেকে সাধ্য মতো সম্ভব আর্থিক সহায়তা ও সহানুভূতি প্রকাশ করায় ভূক্তভোগীরা তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। **তদন্তকালে কমিশনের নিকট "ক্ষতিগ্রস্থ ও নির্যাতিত ব্যক্তিগণ সকলেই আর্থিক সাহায্যের আকুল আবেদন করেন। তাদের নায্য প্রত্যাশা অনুযায়ী এ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে সরকারের পক্ষ হতে জেলাভিত্তিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করা সমীচিন মর্মে কমিশন মনে করে ও সুপারিশ করছে।**

২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী সরকারের সময় সহিংস ঘটনার সংখ্যা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় ১৮,০০০ (আঠার হাজার)- এরও উর্ধ্বে। সহিংসতার প্রায় ৯ বৎসর পর গঠিত একটি মাত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৫৫৭১ টি। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় ইহা সুপ্রমানিত যে সাধারণত একটি মাত্র স্পর্শকাতর জনগুরুত্বসম্পন্ন অপরাধ/সহিংসতার ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয় এবং একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনাস্থলে সংঘটিত অপরাধ তদন্তের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ থাকে। দেশব্যাপী সংঘটিত হাজার হাজার সহিংস ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত/অনুসন্ধান করা একটি মাত্র তদন্ত কমিশনের পক্ষে বাস্তবতার দৃষ্টিতে সম্ভব কিনা তা দেশের সচেতন জনগণের চিন্তা ভাবনার অবকাশ আছে বলে কমিশন মনে করে। তদুপরি অত্র কমিশন তাদের সামর্থ, অপ্রতুল জনবল, নির্ধারিত মেয়াদ বিবেচনায় ৩৬২৫ টি সহিংস ঘটনার তদন্ত/ অনুসন্ধান সম্পন্ন করে দূরূহ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হলেও বাস্তব কারণেই এখনও উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক সহিংস ঘটনা অন্তরালে রয়ে গেছে। অগোচরে বা দৃশ্যপটে না আসা সহিংস ঘটনা সমূহের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে কমিশন মনে করে। **উপরোক্ত তদন্ত কাজ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে প্রতিটি জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী পুলিশ সুপার এবং নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমন্বয়ে একটি করে স্বল্প মেয়াদের তদন্ত কমিটি/কমিশন গঠন করা যেতে পারে। সরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারেন।** উক্ত কমিশনকে নিজ জেলায় তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে অভিযোগ সংগ্রহ ও তদন্ত পূর্বক অনুর্ধ ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরকারের বরাবর প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। জেলা ভিত্তিক তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অত্র বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে তদন্ত সম্পন্নকৃত সহিংসতার ঘটনাসমূহের বিয়োজন বা সংযোজন করে নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনার পূনাঙ্গরূপ দেয়া সম্ভব হবে। **এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি মনিটরিং সেল স্থাপন করা যেতে পারে।**

প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত এবং মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান/তদন্তে অজ্জিতার আলোকে ইহা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ব্যাপকহারে সংঘটিত হওয়া সত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তি (ভিকটিম) স্থানীয় পর্যায়ে আইনগত সুবিধা পায়নি। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অবৈধ প্রভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিকটিমগন চিহ্নিত দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি এবং থানা ও মামলা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব হলেও রাজনৈতিক প্রভাবে সুষ্ঠু তদন্ত না করে আসামীগনকে অব্যাহতির সুপারিশসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে অভিযোগপত্র দায়ের করা সম্ভব হলেও পরবর্তীতে চাপ প্রয়োগ করে সাক্ষ্য প্রমান ব্যতীত অভিযুক্ত দলীয় সন্ত্রাসীগন আদালত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। জোর পূর্বক

বিচারকালে সাক্ষ্য হাজির করতে দেওয়া হয়নি বা হুমকির মুখে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে এজাহারকারী/বাদীকে বাধ্য করা হয়েছে। সর্বোপরি গনহারে সরকার কথিত রাজনৈতিক মামলা গণ্যে ৫৮৯০ টি মামলা প্রত্যাহার করে চিহ্নিত দলীয় সন্ত্রাসীদের মুক্তি দিয়েছে। এছাড়া ৯৪৫ টি মামলা থেকে বেছে বেছে বিএনপি দলীয় ক্যাডার আসামীদের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামাত জোটের অনৈতিক রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা নির্যাতিতরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ বা আদালতে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

অবশ্য গণমাধ্যম, বিরোধী রাজনৈতিক দল, জাতীয় ও আন্তজার্তিক মানবাধিকার সংগঠন এবং জনমতের অব্যাহত চাপের মুখে দুই একটি চাঞ্চল্যকর অপরাধের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। নির্বাচনোত্তর সহিংসতার সাথে সংশ্লিষ্ট গুটি কয়েক মামলা তীক্ষ্ণ নজরদারী ও তদারকির কারণে অভিযুক্তদের অনুকুলে নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় এখনও তা বিচারাধীন আছে। ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় নির্যাতিত ব্যক্তিগণ (ভিকটিমগণ) রাজনৈতিক অবৈধ প্রভাবের কারণে তৎসময়ে অভিযোগ দায়ের করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব হলেও ন্যায় বিচার না পাওয়ায় বিদ্যমান আইনে এবং প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বর্তমানে আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ আছে। **রাজনৈতিক/প্রতিপক্ষ প্রতিহিংসার মাধ্যমে নির্বাচনোত্তর সহিংসতার দ্বারা দেশে বার বার মানবিক দূর্যোগ সৃষ্টির এ ধারা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য কমিশন আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির মাধ্যমে এ সহিংসতা রোধ সম্ভব।**

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের দৃষ্টিতে প্রাপ্ত এবং প্রাথমিক তদন্তকৃত অভিযোগসমূহ সম্পর্কে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো ঃ

(ক) সহিংস ঘটনা পরবর্ত্তীতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে ব্যর্থ হয়েছে। অত্র কমিশনের বরাবর তৎকালীন সংঘটিত সহিংসতার অভিযোগ দায়ের ও তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার ক্ষেত্রে।	(ক) সংশ্লিষ্ট থানায় বিলম্বের সন্তোষজনক ব্যাখাসহ অভিযোগে উল্লেখিত আসামীদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ফোজদারী আইনে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদির কোন প্রশ্ন নেই।
(খ) নির্বাচনোত্তর সহিংস ঘটনার জন্য এজাহার দায়ের করা হলেও এবং সাক্ষ্য প্রমান থাকা সত্বেও রাজনৈতিক প্রভাবে সঠিক তদন্ত ছাড়াই চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার ক্ষেত্রে।	(খ) চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে অব্যাহতি প্রাপ্ত আসামীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন নিজ উদ্যোগে অতিরিক্ত তদন্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করতে পারেন। ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোডের ১৭৩ (৩বি) ধারা অনুসারে ইহা আইন সিদ্ধ। (সামসুন্নাহার ওরফে ময়না বনাম রাষ্ট্র, ১৯৮৪ বিএলডি (এডি) ২০৬। অথবা এজাহারকারী/বাদী চূড়ান্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে নারাজি দরখাস্ত (Petition of complaint) দাখিল করতে পারেন। চূড়ান্ত রিপোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বা বিচারকের উপর বাধ্যকর নয় বিধায় নারাজি দরখাস্ত পাওয়ার পর ম্যাজিষ্ট্রেট এজাহারকারীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে

	উপকরণ বিদ্যমান থাকলে নিজেই অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করতে পারেন অথবা অতিরিক্ত তদন্তের নির্দেশ দিবেন (শাজাহান আলী মন্ডল বনাম বেলায়েত হোসেন, ৪৭ ডিএলআর (১৯৯৫) ৪৭৮। নারাজি দরখাস্তে মূল অভিযোগের পূর্ণ বিবরণসহ তদন্তের ত্রুটির উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।
(গ) এজাহার দায়েরের পর তদন্ত শেষে চার্জসিট দাখিল করা হয় কিন্তু সাক্ষ্য প্রদান কালে রাজনৈতিক চাপে সাক্ষ্য ওলট পালট করে অব্যাহতির ক্ষেত্রে।	(গ) খালাসের রায় ও আদেশের অসম্মতিতে এজাহারকারী কর্তৃক রিভিশন দায়ের করা যেতে পারে। ফোজদারী কার্যবিধির ৪৩৯ ও ৪৩৯ (এ) ধারা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে। রিভিশনে তামাদি বাধা হবে না যদি সন্তোষজনক ব্যখ্যা দেওয়া যায়। {মোঃ জিয়া উদ্দিন আহম্মেদ বনাম রাষ্ট্র ১৭ বিএলডি (এডি) (১৯৯৭) ১২৩}।
(ঘ) আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে কিন্তু চার্জ গঠন করার সময় রাজনৈতিক প্রভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট/ সেশন জজ কর্তৃক ডিসচার্জ আদেশের ক্ষেত্রে।	(ঘ) ডিসচার্জ আদেশ ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়ে থাকলে ফোজদারী কার্য বিধি ৪৩৯ ধারা অনুবলে সেশন জজের নিকট এবং সেশন জজ দিয়ে থাকলে ফোজদারী কার্য বিধি ৪৩৯ (এ) ধারা অনুবলে হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন দায়ের করা যাবে। এক্ষেত্রে তামাদির প্রশ্নে উপরে বর্ণিত ১৭ বিএলডি (এডি) সিদ্ধান্তের সুবিধা প্রাপ্য।
(ঙ) মামলার বাদী সাক্ষী নিয়ে হাজির থাকা সত্বেও রাজনৈতিক প্রভাবে সাক্ষীদের পরীক্ষা না করে এরই ধারাবাহিকতায় ২/৩ টি বিচারের ধার্য তারিখে সাক্ষী আসেনাই এই অজুহাত দেখিয়ে মোকাদ্দমা ডিসচার্জ/ খালাস করার ক্ষেত্রে।	(ঙ) ডিসচার্জ আদেশ হয়ে থাকলে রিভিশন করা যাবে আর খালাস হয়ে থাকলে আপিল করতে হবে।
(চ) আদালতের মামলা চলাকালীণ রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকার কর্তৃক ফোজদারী কার্যবিধির ৪৯৪ ধারা অনুবলে প্রসিকিউশন প্রত্যাহারের নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিচারিক আদালতের সম্মতিতে (With the consent of the Court) মামলা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে।	(চ) সাধারণত চার্জ গঠণের পূর্বে মামলা প্রত্যাহার করা হলে আসামীদের ''ডিসচার্জ'' করা হয়ে থাকে। চার্জ গঠনের পর মামলা প্রত্যাহার করা হলে আসামীদের মামলা থেকে ''অব্যাহতি'' আদেশ হয়। উভয় ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশের বিরুদ্ধে সেশন জজের নিকট এবং সেশন জজের আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিভিশন আকারে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাবে। সরকারের প্রত্যাহার সংক্রান্ত আদেশে কোন কারণ বা অজুহাত যদি বর্ণিত না থাকে এবং আদালতের সম্মতির আদেশে উপাদান

সমূহ বিবেচনা করেছে মর্মে উল্লেখ না থাকলে উক্ত প্রত্যাহার আদেশ বাতিল হতে পারে। { শ্রীমতি প্রতিভা রানী দে বনাম ডাঃ মোঃ ইউসুফ, ২০ বিএলডি (এডি) ২০০০ পৃষ্ঠা ৫৪ }। তামাদির প্রশ্নে উপরে বর্ণিত ১৭ বিএলডি (এডি) ১২৩ মামলার নজীরের সুবিধা প্রাপ্য।

বিশেষ ট্রাইবুনাল (বিশেষ ক্ষমতা আইন) অনুসারে বা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের অসম্মতিতে আপিলের বিধান আছে বিধায় রিভিশন চলবে না, আপিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা যায় নাই এবং তামাদি আইনের ৫ ধারা বিধান ঐ সকল আইনে প্রয়োগ করার সুযোগ না থাকায় ফোজদারী কার্যবিধি ৫৬১ (এ) ধারায় হাইকোর্ট ডিভিশন বরাবর প্রতিকারের আবেদন করা যাবে। {সোহেল আহমেদ চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র ১৫ বিএলডি (১৯৯৫) ২৩৯ এইচ, সি }। ৪৭ ডিএলআর (১৯৯৫) ৩৪৮ এইচ, সি। { সামছুল হক বনাম রাষ্ট্র ৪৩ ডিএলআর (১৯৯১) ২৪৭ এইচ, সি}। { ভাসী বনাম রাষ্ট্র ৪৩ ডিএলআর (১৯৯১) ২০৯ এইচ, সি।

কমিশনের নিজস্ব বিবেচনায় উপরে বর্ণিত আইনের বিধানসমূহ প্রয়োগ সম্পর্কে মতামত দেওয়া হলো ঃ

আইনের বিধানসমূহের নানামুখী ব্যাখ্যার সুযোগ থাকায় প্রয়োগের সময় আইন বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করার স্বার্থে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা/ আইন শাখার সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি সমন্বয় সেল গঠন করা আবশ্যক হবে। উপরন্তু জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞ পিপি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একজন প্রতিনিধি (নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের নির্বাচনোত্তর সহিংসতার সাথে সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে কমিশন মনে করে।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতার কয়েকটি স্পর্শকাতর ঘটনার নমুনা

মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নারকীয় পৈশাচিকতার শিকার, ''লালমোহনের ভেন্ডারবাড়ী''।

দুই রাতে ৬০/৭০ জনেরও বেশি নারী বিএনপি সন্ত্রাসী কর্তৃক ধর্ষিত ঃ

ঘটনাস্থল ঃ ভোলা লালমোহন উপজেলার লর্ডহার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের ভেন্ডারবাড়ী।

২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সহিংস ঘটনা ঘটলেও সকল মাত্রা ছাড়িয়ে শীর্ষে আছে ভোলা জেলার লালমোহন থানাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউপি'র অন্নদাপ্রসাদ গ্রামস্থ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভকারী " ভেন্ডারবাড়ী "। নির্বাচনের পর পরই শুরু হয় দেশব্যাপী আওয়ামীলীগ কর্মী সমর্থক বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন নিপীড়ন। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ এবং ভেন্ডারবাড়ী থেকে থানা প্রায় ২৫ কিঃমিঃ দুরে হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের লোকজন এমনকি সংবাদ কর্মীরাও নির্বাচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। বাড়ীঘর লুটপাট, চাঁদা দাবি, এমনকি নারী ধর্ষণের অজস্র ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে অধিকাংশ ঘটনাই পুলিশের নথিভূক্ত হয়নি। অত্র তদন্ত কমিশন কর্তৃক ভেন্ডার বাড়ীর সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক বার উক্ত এলাকা সরজমিনে ব্যাপক অনুসন্ধান করা হয়। অনুসন্ধানকালে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায় সেই লোমহর্ষক, বর্বরোচিত নির্যাতনের কাহিনী। ভূক্তভোগীদের অনেকে ঘটনার কথা স্বীকার করিলেও কোন প্রকার লিখিত বক্তব্য বা সাক্ষ্য দিতে চাচ্ছেন না। আবার অনেকেই ঘটনার বিবরণ দিয়ে নাম ঠিকানা প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেন তদন্ত কমিশনকে।

এলাকাবাসীকে জিজ্ঞাসাবাদে আরো জানা যায় ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে লালমোহনের বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু ছিল আতংকে, নির্বাচনের পর ২রা অক্টোবর অন্নদা প্রসাদ গ্রামের আশেপাশের গ্রামের সংখ্যালঘু মহিলারা নিরাপদ স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের চার পাশের ধানক্ষেত ও জলাভূমি পরিবেষ্টিত ভেন্ডার বাড়ী । প্রায় অর্ধশতাধিক মহিলারা তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য সেখানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সে বাড়ীটিও সন্ত্রাসীদের নজর এড়ায়নি। শত শত বিএনপি সন্ত্রাাসী ৮/১০টি দলে বিভক্ত হয়ে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঐ দিন রাত আনুমানিক ১০.০০ ঘটিকার সময় পালাক্রমে হামলা চালায়। মহিলারা তাদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি। অনেকে সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে অন্ধকারে ঝাপিয়ে পড়ে আশ-পাশের জলাশয়ের ধানক্ষেতে। মহিলারা যখন পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে তখন তাদের শিশুদের পানিতে ছুড়ে ফেলার হুমকী দিয়ে পানি থেকে তাদেরকে উঠে আসতে বাধ্য করে সন্ত্রাসীরা। এভাবে ধর্ষিত হয়েছে আট বছরের শিশু, লাঞ্ছিত হয়েছে ৬৫ বছরের বৃদ্ধা, মা, মেয়ে, শ্বাশুড়ি, পুত্রবধুকে ধর্ষণ করা হয়েছে এক সাথে। ছেলের চেয়েও ছোট বয়সী সন্ত্রাসী কর্তৃক মায়ের বয়সী নারী ধর্ষণ হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ছাড়েনি পঙ্গু নারী শেফালী রানী দাসকেও। শেফালী রাণী পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের মত সন্ত্রাসীদের কবল থেকে বাচার জন্য পালানোর চেষ্টাকালে পুকুর পাড়ে হলুদ ক্ষেতে পড়ে যায় তখন দুইজন সন্ত্রাসী তাকে ধরে ফেলে। সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন । পরবর্তীতে চরফ্যাশন হাসপাতালে তার চিকিৎসা করানো হয়। ভুক্তভোগীরা অনেকেই লজ্জায় ভয়ে দেশ ছেড়ে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছে।

ভেন্ডারবাড়ীর সদস্য প্রনোদ চন্দ্র দাস (৪০) পিতা-যোগেন্দ্র কুমার দাস, সাং অন্নদা প্রসাদ তদন্ত কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে লিখিতভাবে জানান যে, ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে তাদের বাড়ীতে পুরুষ/মহিলাসহ অনুমান ২০০ জন আশ্রয় নেয়। তার মধ্যে ৭০/৮০ জন মহিলা ও বাচ্চারা ছিল। তাদের বাড়ীতে ০২/১০/২০০১ তারিখে বিএনপি সন্ত্রাসীরা ৬০/৭০ জন আক্রমণ করে। চাঁদপুর অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের আবু, সেলিম, দুলাল, জাকির পিং আঃ খালেকগণ ছিল অন্যতম। তদন্ত কমিশন কর্তৃক তার লিখিত দরখাস্ত গ্রহণ করে আশপাশের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়।

ভেন্ডারবাড়ীর অন্য সদস্য গংগাচরণ দাস পিতা মৃত-বই কুন্দু কুমার দাস সাং অন্নদাপ্রসাদ, থানা- লালমহোন, ভোলা লিখিত ভাবে কমিশনের কাছে অভিযোগ করেন যে, ০৩-১০-০১ তারিখ রাত ৯.০০/১০.০০ টায় তার বাড়িতে ৬/৭ জন সন্ত্রাসী (১) দুলাল পিতা- কব্বর আলী সাং চাঁদপুর (২) আলমগীর পিতা আঃ মুন্নাফ সাং অন্নদাপ্রসাদ, (৩) সোহাগ মিয়া সাং অন্নদা প্রসাদ (৪) নজরুল, পিতা -মৃত বদিউজ্জামান, সাং চাঁদপুর (৬) মোঃ আক্তার পিতা- আঃ হাই সাং ফাতেমাবাদগণ জোর পূর্বক তার বাড়ীতে প্রবেশ করে তার বিভিন্ন মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। আসামীরা তার স্ত্রী শেফালী বালা দাস ও কন্যা সুষমা রাণী দাসদের ধর্ষণ করে। তার জানামতে ভেন্ডারবাড়ী (১) অর্চনা রাণী দাস প্রসাদ স্বামী নিতাই লাল দাস, বর্তমানে ভারতে (২) ববিতা রাণী দাস, পিতা সুধানিয়া কুমার দাস বর্তমানে ভারতে (৩) নিহারী রাণী দাস স্বামী মিলন কুন্দ দাস (৪) চারু বালা দাস স্বামী উমেশ চন্দ্র দাস, বর্তমানে ভারতে। (৫) সাধনা রাণী দাস স্বামী বেচারাম দাস, (৬) উষা রানী দাস, স্বামী হীরা লাল দাস (৭) মাধবী বালা দাস, স্বামী মাইন চন্দ্র দাস, (৮) মাধুরী বালা দাস, স্বামী ক্ষেত্র মোহন দাস, বর্তমানে ভারতে। (৯) গীতা রাণী দাস, স্বামী সমীরন দাস, বর্তমানে ভারতে (১০) প্রিয়াংকা বালা দাস, পিতা বেচারাম দাস, বর্তমানে ভারতে (১১) স্বরোধনী বালা দাস, স্বামী ব্রজবাশী দাস (১২) কুসম বালা দাস, স্বামী পরিমেল কুমার (১৩) বিষ্ণু রাণী দাস, স্বামী রমানী কুমার দাস, (১৪) সুলতা রাণী দাস, স্বামী যাদব চন্দ্রা দাস, (১৫) সবিতা রাণী দাস, স্বামী শ্রী দাস চন্দ্র, বর্তমানে ভারতে। (১৬) শেফালী রাণী দাস, স্বামী সুবাস চন্দ্র দাস (১৭) রীতা বালা দাস, পিতা-গফুর চন্দ্র দাস, (১৮) শেফালী বালা, স্বামী- সুভাষ দাস, (১৯) রিংকু রানী, স্বামী- গোরাঙ্গ দাস, (২০) পুষ্প রানী, স্বামী- ব্রজলাল দাস, সর্ব সাং চর অন্নদাপ্রসাদ, থানা লালমোহন, ভোলাসহ প্রায় আরো ৬০/৭০ জন আশ্রীত মহিলা ধর্ষণের শিকার হন। দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিযোগকারীরা থানায় কোন মামলা করতে পারেনি/করেননি। তদন্ত কমিশন অভিযোগের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে সরজমিনে অনুসন্ধানকালে আশপাশের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা পায়।

বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

(১) দুলাল, পিতা আলী আকবর, সাং চাঁদপুর, থানা- লালমোহন, ভোলা।

(২) ইব্রাহীম খলিল, পিতা- মৃত মৌলভী মোহাম্মদ, সাং অন্নদাপ্রসাদ, থানা- লালমোহন, ভোলা।

(৩) আকতার (৩৫) পিতা- জাফর উল্যাহ, সাং চাঁদপুর, থানা- লালমোহন।

(৪) সাইফুল (৪০) পিতা- ওসমান গণি, সাং- অন্নদাপ্রসাদ,

(৫) শাহাবুদ্দিন পিতা- আঃ হাই সাং চাঁদপুর

(৬) মোতাহার (৩৫) পিং সামছুল হক, সাং- ফাতেমাবাদ,

(৭) ভুট্রো পিতা মোস্তফা , সাং অন্নদা প্রসাদ

(৮) নান্নু (৩৭), পিতা লুৎফর রহমান, সাং ফাতেমাবাদ

(৯) আলমগীর পিং আবুল হাশেম সাং সৈয়দাবাদ

(১০) সেলিম, পিতা ইয়াসিন মাষ্টার, সাং অন্নদা প্রসাদ

(১১) জাকির পিতা আঃ মালেক, সর্ব থানা- লালমোহন, ভোলা।

(১২) নজরুল, পিতা- বদিউজ্জামান, (১৩) আবু, পিতা- জলিল, (১৪) মিজান, পিতা- ইসহাক, (১৫) ইদ্রিস, পিতা- আঃ কাদের

(১৬) মোশারফ, পিতা- শাহাবুদ্দিন মিয়া, (১৭) বাবলু, পিতা- নুরুজ্জামান, (১৮) কামরুল, পিতা- নুরুজ্জামান, সর্বসাং- অন্নদাপ্রসাদ, লালমোহন ভোলাসহ অজ্ঞাত নামা আরো ২০/২৫ জন যাহাদের নাম ঠিকানা আজও কেউ বলতে পারে না।

মুক্তারপুর গ্রামে আওয়ামীলীগ ভক্তের উপর হামলা। দু পা কেটে নিল সন্ত্রাসীরাঃ
ঘটনাস্থল ঃ যশোর চৌগাছা উপজেলা।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে চৌগাছা-ঝিকরগাছা আসনে জয়লাভ করে আওয়ামীলীগ প্রার্থী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী জয়লাভ করায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ ভক্ত আব্দুল বারিক মন্ডল, পিতা- জিনাত উল্লাহ মন্ডল, সাং- ভাদড়া, ডাকঘর- মুক্তারপুর, চৌগাছা, যশোর তার বাড়ীতে গরু জবাই করে ভোজের আয়োজন করে। সেই আক্রোশে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামীলীগ প্রার্থী পরাজিত হলে বিএনপি ও জোট সন্ত্রাসী ১। মোঃ সেলিম, পিতা- মোঃ শামছুর রহমান, ২। মোঃ মানিক, পিতা- শাহাজাহান, ৩। মোঃ তরিকুল ইসলাম, পিতা- আব্দুল বিশ্বাস, ৪। মোঃ ওবায়দুল ইসলাম, পিতা- ওয়াহেদ আলী, ৫। মোঃ মোড়ল, পিতা- ওয়াহেদ আলী, ৬। আহাম্মদ আলী, পিতা- হাতেম বিশ্বাস, ৭। আব্দুল আজিজ, পিতা- বক্ত জামাল, ৮। মোঃ আবু মন্ডল, পিতা- মোঃ খালেক, ৯। মোঃ ইব্রাহিম, পিতা- জাভেদ আলী মন্ডল, ১০। মোঃ আঃ রশিদ, পিতা- মাসুদ আলী, সর্বসাং- ভাদড়া, চৌগাছা, যশোরগন বেআনী জনতায় দলবদ্ধ হইয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভিকটিমকে তার বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তার দুটি পা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সন্ত্রাসীরা ভিকটিম মারা গেছে ভেবে চলে গেলে তাকে মুমুর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘদিন উন্নত চিকিৎসার পর সে প্রাণে বেঁচে গেলেও সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। তদন্ত কমিশন সরেজমিনে যশোর পরিদর্শনে গেলে ভিকটিম কমিশনের সামনে উপস্থিত হয়ে সেদিনের নির্যাতনের কাহিনী বর্ননা করেন। যা কমিশন চেয়ারম্যান লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত ঘটনা সাবেক বিএনপি মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের ইন্ধনে ঘটানো হয়েছে বলেও জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন।

বাঘমারার রজুফা @ কাজলী ধর্ষণ ঃ
ঘটনাস্থল ঃ রাজশাহীর বাঘমারা।

গত ইং ২১.০৩.০২ তাং দিবাগত রাত্রিতে বাড়ীর সকলে রাত্রির খাওয়া শেষ করে বাদী মোঃ রজব আলী পিতা মৃত আমির সিকদার সাং কোন্দা থানা বাঘমারা, জেলা রাজশাহী ও তার স্ত্রী অলকজান একটি ঘরে এবং তার ছেলে জুয়েল ও মেয়ে রজুফা @ কাজলী (৮) অপর একটি ঘরে ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি অনুমান ৩.০০ টার সময় বিএনপি সমর্থিত আসামী (১) আশরাফুল আলম (২) ইসরাফিল (৩) রহিম উদ্দিন (৪) মকে @ মকলেছুর (৫) জাকিরুল @সান্টু (৬) আসকান @আমিনুল ও আমজাদ হোসেন সর্ব সাং কোন্দা থানা বাঘমারা জেলা রাজশাহীগণ ঘরের তালা ভেংগে ঘরে প্রবেশ করে বাদীর নাবালিকা মেয়ে রজুফা @ কাজলীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে । এক পর্যায়ে রজুফার ভাই জুয়েলের গলায় একজন চাকু ধরে। অন্যান্য আসামীদের কেউ রজুফার হাত কেউবা পা ধরে রাখে এবং অতপর আসামী আশরাফুল চাকু দ্বারা রজুফার যৌনাংগের নিকটের পাজামা কেটে আসামী তাকে ধর্ষণ করে। প্রকাশ থাকে যে, চাকু দ্বারা পাজামা কাটার সময় চাকুর আঘাতে রজুফার যৌনাংগের অংশ বিশেষ কেটে রক্তাক্ত জখম হয়। নরপশু আসামীগণ ঐ অবস্থায় রজুফাকে আসামী আশরাফুল ধর্ষণ করে। তার চিৎকারে তার বাবা মা জাগা পেয়ে ঘর থেকে বের হলে আসামীগণ পালিয়ে যায়। পরে রজুফাকে মুমুর্ষ অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় ডাক্তারের নিকট পরে ডাক্তারের পরামর্শে রাজশাহীতে সেবা ক্লিনিকে নিয়ে চিকিৎসা করায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করলে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ মোতাবেক বাঘমারা থানায় মামলা রুজু হয় যা বাগমারা থানার মামলা নং ৪ তাং ০৫/০৪/২০০২ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৯(১)/৩০ রজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে সকল আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। বিজ্ঞ বিচারক বিচার শেষে অত্র মামলার অভিযুক্ত কিশোর অপরাধী (১) মোঃ আশরাফুল আলম (২) মোঃ ইসরাফিল (৩) মোঃ রহিম উদ্দিন (৪) মকে @ মকলেছুর রহমান কে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং প্রত্যেককে ১০,০০০/- টাকা করে জরিমানা এবং অন্যদের খালাস প্রদান করেন।

ভিকটিম রজুফা @ কাজলী বর্তমানে রাজশাহী শহরের সাগর পাড়ায় এ, সি, ডি (এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট) এ অবস্থান করে সেখানে ভোলানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে বলে জানা যায়।

ধর্ষণের অপমান সইতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিল কিশোরী মহিমা ঃ
ঘটনাস্থল ঃ রাজশাহীর পুঠিয়া থানা।

গত ইং ১৫.০২.০২ তারিখ বিকাল অনুমান ৫.০০ টার সময় মোছাঃ মহিমা খাতুন (১৪) পিতা আঃ হান্নান সাং-কাঠাল বাড়ীয়া থানা পুঠিয়া জেলা রাজশাহী তার নিজ বসতবাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে একটি কাঁঠাল গাছ থেকে পাতা পেড়ে ছাগলকে খাওয়ানোর সময় বিএনপি সমর্থিত আসামী (১) ফরিদ পিতা সেকেন্দার (২) ফারুক, পিতা মোতালেব উভয় সাং কাঁঠাল বাড়ীয়া (৩) সেলিম পিতা খলিল সাং সেনবাগ (৪) উজ্জল পিতা মোশারফ সাং পীরগাছা (৫) মোশারফ হোসেন পিতা সহঃ জবেদ আলী সাং ঐ (৬) সেকেন্দার আলী পিতা মৃঃ মাহাতাব (৭) আঃ মোতালেব পিতা মৃত সৈয়দ আলী উভয় সাং কাঁঠাল বাড়ীয়া ও (৮) খলিল পিতা লোকমান সাং বড় সেনভাগ সর্ব থানা পুঠিয়া জেলা রাজশাহীগণ তাকে জোর পূর্বক পার্শ্ববর্তী আবু বাক্কার পিতা আঃ সালামের আখক্ষেতে নিয়া যায় এবং আসামীগণ পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। তাছাড়াও আসামীগণ মহিমা খাতুনের বিবস্ত্র অবস্থায় ছবি তোলে। ঘটনাটি প্রথমে স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসার চেষ্টা চলে। কিন্তু স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসার না হওয়ায় মহিমা খাতুন সম্ভ্রম হানীর অপমানে ১৯/২/২০০২ তাং বেলা অনুমান ১১.৩০ টার সময় বিষপান করে। তাকে সংগে সংগে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে।

পরবর্তীতে মহিমা খাতুনের পিতা মোঃ আঃ হান্নান বাদী হয়ে পুঠিয়া থানায় অভিযোগ করলে পুঠিয়া থানার মামলা নং ২১ তাং ১৯.২.০২ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৭/৯(৩)/১০ এবং পুঠিয়া থানার মামলা নং ২২ তাং ১৯/০২/২০০২ ধারা ৩০৬ দঃবিঃ রুজু হয়। ঘটনাটিতে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ায় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) সহ তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মামলা ০২(দুই)টি তদন্ত শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। বিচার শেষে বিজ্ঞ আদালত মামলা নং ২১ তাং ১৯.০২.০২ ধারা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৭/৯(৩)/১০ এ সকল আসামীদের ফাঁসির আদেশ প্রদান করেন এবং মামলা নং-২২ তারিখ-১৯/০২/২০০২ ইং ধারা-৩০৬ দঃবিঃ এর সকল আসামীদের ২ থেকে ৭ বৎসর পর্যন্ত কারা দন্ডের আদেশ প্রদান করেন।

নির্মম নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করলেন ধর্ষিতা ছবি রানী মন্ডল ঃ
ঘটনাস্থল ঃ বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলা।

সরেজমিনে তদন্তের জন্য কমিশনের সদস্যগন ১৫/০৪/২০১০ বৃহস্পতিবার রাতে পিরোজপুর থেকে বাগেরহাট সার্কিট হাউসে আসেন। ১৬/০৪/২০১০ তারিখ সকাল ১০ টা থেকে কমিশন নির্যাতিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করেন। সার্কিট হাউজে উপস্থিত ছিলেন বাগের হাট জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বাগেরহাট-৪ আসনের সাংসদ মোজাম্মেল হোসেন এবং বাগেরহাট-৩ আসনের সাংসদ সৈয়দ হাবিবুন নাহার। এ সময় কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেন গনধর্ষণের শিকার ছবি রানী মন্ডল। ধর্ষণের সময় তার বয়স ছিল ২০ বছর এখন ৩০ বছর। তিনি তার উপর নির্যাতনের কাহিনী বর্ননা করতে গিয়ে বলেন ২০০২ সনের ২১ আগষ্ট বিএনপির নেতা মল্লিক মিজানুর রহমান ওরফে মজনু ও বাশার কাজীর নির্দেশে সন্ত্রাসী ১। মজনুর রহমান (বিএনপি থানা আহবায়ক), ২। আবুল বাসার, ৩। তায়েব নুর, ৪। কামাল শিকারী, ৫। কামাল ইজারাদার, ৬। বজলুর রহমান, ৭। পলাশ, ৮। মাঝে শিকদার, ৯। ইল ফরাজী, ১০। হিমু কাজী, ১১। জিন্না নুর প্রহরী, ১২। ইমদাদ, ১৩। এমএ মান্নান, ১৪। হারুন মল্লিক, ১৫। মোস্তাফিজুর রহমান, ১৬। হাফিজ উদ্দিন, ১৭। আলতাবগন গত ২১/০৮/২০০২ সন্ধা আনুমানিক ৭.০০ হতে ৭.৩০ ঘটিকায় বিএনপি অফিসে ডেকে নিয়ে চুল কেটে দেয়, উলঙ্গ করে শুয়াইয়া হাতুড়ী দিয়ে পিটায় নগ্ন ছবি উঠায়, পানি খেতে চাইলে প্রসাব করে খেতে দেয় ও পালাক্রমে ধর্ষণ করে। তার যৌনাঙ্গে বালু ও কাচেঁর গুড়া ঢুকিয়ে দেয়। জবান বন্দি দেওয়ার সময় তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। জবানবন্দী প্রদান কালে তার শরীরের উপর নির্যাতনের কয়েকটি চিহ্ন কমিশনের সদস্যদের দেখান। ছবি রানী মন্ডল তদন্ত কমিশনকে জানান বাগেরহাট আদালতে এ মামলা চলাকালে জেলা বিএনপির সে সময়ের সভাপতি ও বাগেরহাট-২ আসানের সাবেক এমপি এম এ এইচ সেলিম তাঁর বাগেরহাটের বাড়ীতে তাকে ডেকে নিয়ে তার কাছ থেকে জোর করে মামলার মীমাংসা পত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে সাক্ষী হাজির করতে না পারায় বাধ্য হয়ে তিনি মামলাটি প্রথমে ঢাকায় এবং পরে খুলনা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করেন।

গণধর্ষনের শিকার হলো কিশোরী পূর্নিমা

ঘটনাস্থল ঃ সিরাজগঞ্জের উল্যাপাড়ার

পনের বছর বয়সের দশম শ্রেণীর ছাত্রী পুর্ণিমা গণধর্ষণের শিকার হয়ে অনেকটা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার দেলুয়া গ্রামের অনিল কুমার শীলের পরিবারের ওপর ২০০১ সাল নির্বাচন পরবর্তী অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ রাতে চালানো হয় ইতিহাসের বর্বরোতম অত্যাচার-নির্যাতন। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা অনীল শীলের ছোট মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে । ঘটনার ৩/৪ দিন পর ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি ধর্ষিত ছাত্রী ও তার পরিবারকে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

সিরাজগঞ্জে অনুসন্ধানে জানা গেছে গত ৮ই অক্টোবর/২০০১ জোট সন্ত্রাসী (১) মোঃ খলিল মিয়া, (২) মোঃ আঃ জলিল মিয়া, (৩) মোঃ লিটন মিয়া (৪) মোঃ আলতাফ হোসেন, (৫) মোঃ আনোয়ার হোসেন (৬) মোঃ রেজাউল হক, (৭) মোঃ আঃ মালেক (৮) মোঃ হোসেন আলী, (৯) মোঃ ছাবেদ আলী (১০) মোঃ আঃ রউফ (১১) মোঃ আঃ মান্নান, (১২) মোঃ মজনু মিয়া (১৩) মোঃ ইউসুফ আলী, (১৪) মোঃ মমিন হোসেন (১৫) মোঃ মনসুর আলী, (১৬) মোঃ জহুরুল ইসলাম (১৭) মোঃ হেভেন মিয়া, (১৮) মোঃ ইয়াসিন আলী, (১৯) মাঃ আব্দুল মিয়া (২০) মোঃ বাবুল মিয়া সহ ২৫/৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল রাতের আধারে অনীল শীলের বাড়ীতে হানা দেয়। তারা অনিলের ছোট মেয়ে পুর্ণিমা রাণী শীলকে অপহরণ করতে গেলে বাধা দিতে গিয়ে অনিলের স্ত্রী বাসনা রাণী সন্ত্রাসীদের হামলায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারা বাড়ীর সবাইকে মারধর করে পুর্ণিমাকে ধরে নিয়ে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

উল্লাপাড়া হামিদা উচ্চ বিদ্যালয়ের এস,এস,সি পরীক্ষার্থীনি পুর্ণিমা গত ১লা অক্টোবরের সংসদ নির্বাচনে নিজ গ্রাম দেলুয়া বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল লতিফ মীর্জার নির্বাচনী এজেন্ট ছিল। তার মা-বাসনা অন্য ভোট কেন্দ্রে মহিলা আনসারের দায়িত্ব পালন করছিলেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার কারণেই এই পরিবারের উপর বিএনপি জোট সন্ত্রাসীরা এই পাশবিক নির্যাতন চালায়। বিএনপি জোট সন্ত্রাসীদের চাপের মুখে থানা পুলিশ অণিল চন্দ্র শীলের নিকট হতে একটি সাদামাটা অভিযোগ নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা বাদ দিয়েই শুধুমাত্র দন্ড বিধির ধারায় একটি মামলা রুজু করে। উল্লাপাড়া থানার মামলা নং- ০৮ তাং ১০/১০/০১ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩৭৯/৩৫৪ দঃবিঃ। উল্লাপাড়া থানার ভূতপূর্ব অফিসার-ইনচার্জ জনাব মোঃ আবুল হোসেন মোড়ল মামলাটি রুজু করে তদন্তভার এস,আই, মোঃ সিরাজুল ইসলাম খানকে অর্পণ করেন। তদন্তকালে ইং ১৬/১০/২০০১ তারিখে ভিকটিম পুর্ণিমা রাণী শীল এর জবানবন্দী কাঃবিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে রেকর্ড করা হয়। ভিকটিম পুর্ণিমা রাণী শীল তাকে ধর্ষণের বর্ণনা বিজ্ঞ আদালতে বর্ণনা করেন। ইং ১৪/১০/২০০১ তারিখে ভিকটিম পুর্ণিমা রাণী শীলের ধর্ষণ সংক্রান্ত ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হয়েছে। ধর্ষণ সংক্রান্ত ডাক্তারী পরীক্ষার মতামত ইং ২০/১০/২০০১ তারিখে পাওয়া যায় যা নিম্নরুপ ঃ

"On the basis of the physical examination and Co-related item with those of pathological examination we the doctors of the board are at opinion that the findings on her body are consistent with recent sexual intercourse"

ভিকটিম পুর্ণিমা রাণী শীল এর বিজ্ঞ আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী এবং ধর্ষণ সংক্রান্ত ডাক্তারী রিপোর্টের আলোকে গত ইং ২৪-১০-২০০১ তাং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের পরামর্শে বিজ্ঞ পিপি সাহেবের সুপারিশসহ বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত, সিরাজগঞ্জে আলোচ্য মামলার ধারার সহিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এর ৭/৯(৩)/১০(১) ধারা সংযোজনের জন্য আবেদন করা হয়। পরবর্তীতে ঊর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার মৌখিক নির্দেশ মোতাবেক ভূতপূর্ব অফিসার ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক শেখ আতাউর রহমান বিগত ইং ০৩/১১/০১ তারিখে মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন। মামলাটি তদন্ত শেষে উল্লাপাড়া থানায় অভিযোগ পত্র নং ১১৫ তাং ৯/৪/২০০২ ধারা ৭/৯(৩)/৩০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ এবং পৃথক অপর একটি অভিযোগ পত্র নং ১১৬ তাং ৯/৪/২০০২ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩৭৯ দঃবিঃ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়েছে। মামলাটি বর্তমানে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে।

পূর্ণিমা ধর্ষণ মামলা যথাযথ আইনের ধারায় গ্রহণ না করা এবং কর্তব্য কর্মে অবহেলার দরুন তৎকালীন উল্লাপাড়া থানার ওসি আবুল হোসেন মোড়লকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এ ধরণের একটি লোমহর্ষক, হৃদয় বিদারক ঘটনাকে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের মাননীয় সাংসদ এম আকবর আলী জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন উল্লাপাড়ায় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের খবর বানোয়াট, কাল্পনিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত । তিনি আরও বলেন উল্লাপাড়ায় ধর্ষণের ঘটনাটি লতিফ মির্জার একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ।

অকালে ঝড়ে গেল মেধাবী ছাত্র ইমরুল কায়েস কনক
ঘটনাস্থল ঃ সিরাজগঞ্জ কাজিপুর উপজেলার চালিতাডাঙ্গা গ্রাম

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজপুর উপজেলার চালিতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রশিদ তালুকাদারের পুত্র মেধাবী ছাত্র ইমরুল কায়েস কনককে পার্শ্ববর্তী সোনামুখী মেলা থেকে বাড়ী ফেরার পথে চালিতাডাঙ্গা বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে **ওৎ পেতে থাকা স্থানীয়** ছাত্রদলের সন্ত্রাসী ১। প্রিন্স, পিতা- মোজাম্মেল হক, ২। খালেক, পিতা- মৃত ছুটকা মন্ডল, ৩। শামিম, পিতা- সোলায়মান, ৪। শামিম, পিতা- জহিরুল@ খোকা, ৫। শাহজামাল @ শাহা, পিতা- পর্বত তালুকদার, সর্বসাং- চালিতাডাঙ্গাসহ মোট ১৭ জন চাইনিজ কুড়াল, রানদা, লোহার রড, হকিষ্ট্রিক ইত্যাদি দ্বারা ইমরুল কায়েস কনককে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে এই সময় কনক বাচাঁও বাচাঁও বলে আত্মচিৎকার করলেও প্রাণ ভয়ে কেহ এগিয়ে আসার সাহস পায়নি । মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে ঢামেক হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করলে পরের দিন দুপুরে তিনি মারা যান। কনকের চাচা আনোয়ার হোসেন ঠান্ডু আসামীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ প্রাথমিক পর্যায়ে মামলার আসামীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠে। সপ্তাহ খানেক পড়েই রহস্যজনক কারণে এই তৎপরতরা ঝিমিয়ে পড়ে। আসামীরা তাদের সহযোগীসহ বাদী ও স্বাক্ষীদের উপর নানা হুমকি দিতে থাকে এতে বাদী ও স্বাক্ষীদের জানমালের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক প্রভাবের কারনে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত সম্ভব না হলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ এবং স্থানীয় জনসাধারনের দাবীর প্রেক্ষিতে এই লোমহর্ষক হত্যাকান্ডটির তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তনের পর তৃতীয় দফা তদন্ত শেষে সিআইডির তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০০৫ সালে যুবদল ও ছাত্রদলের ১৭ নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করে চার্জসিট দাখিল করে। দীর্ঘদিন মামলাটির বিচার কার্য শেষ হয়নি। বর্তমানে মামলাটি (এস,সি ২৮/২০০৭) সিরাজগঞ্জ জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন আছে।

নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরি সহিংস হত্যাকান্ড ঃ-

ঘটনাস্থল ঃ **চট্টগ্রাম।**

বিগত ১৬ ই নভেম্বর/২০০১ শুক্রবার সকাল সোয়া ৭ টায় ৪ অস্ত্রধারী অজ্ঞাত পরিচয় যুবক ডিবি পুলিশের পরিচয় দিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর ব্যস্ততম জামাল খান রোডের বাসায় হাটহাজারী কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীকে (৬০) মাথায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা সকলেই জামাত শিবিরের ক্যাডার। জামায়াত শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা সুপরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ১৬ ই নভেম্বর চট্টগ্রাম মহানগরীর জামাল খান, মোমিন রোড এলাকায় অঘোষিত হরতাল পালিত হয়। রাস্তাজুড়ে ছিল প্রতিবাদ মিছিল।

জামায়াত শিবিরের অবৈধ অস্ত্রধারীদের গুলিতে নিহত নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর নৃশংস হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তার স্ত্রী রেলওয়ে অডিট অফিসার মিসেস উমা মুহুরী বাদী হয়ে চট্রগ্রামের কোতয়ালী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। এ ঘটনায় কোতয়ালী থানার মামলা নং- ৪২ তাং ১৬/১২/২০০১ ধারা ৩০২/১২০(খ)। ৩৪ পেঃ কোঃ রুজু হয়। তদন্ত শেষে কোতয়ালী থানায় অভিযোগ পত্র নং ৬৩৫ তাং ১৩/১১/২০০২ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করা হয়। মোট ১১ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়। বিচার শেষে আসামী (ক) গিট্রু নাসির; (খ) তসলিম উদ্দীন ওরফে মন্টু; (৩) আজম ও (৪) আলমগীর কবির ওরফে বাইজা আলমগীরের ফাঁসির আদেশ হয়। পরবর্তীতে গিট্যু নাসির ক্রস ফায়ারে মৃত্যু বরণ করে। আসামী (১) মহিউদ্দীন ওরফে মাইন উদ্দীন (২) হাবিব খান, (৩) শাজাহান এবং (৪)সাইফুল ওরফে ছোট সাইফুলসহ ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ হয় এবং আসামী (১) ইদ্রিস মিয়া (কলেজ শিক্ষক), (২) তফাজ্জল আহাম্মেদ ও (৩) জহিরুল হককে বিজ্ঞ আদালত খালাস প্রদান করে।

নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী কলেজ পরিচালনায় সাহসের সাথে সকল ধরণের অন্যায়, অনিয়ম ও অবৈধ চাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বলেই জামাত শিবিরের স্বার্থান্বেষী ক্যাডাররা তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। হত্যাকান্ডটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী শুক্রবার বন্ধের দিনকে সন্ত্রাসীরা বেছে নিয়েছে।

অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরীর মৃত্যুর পর পরই বন্দর নগরী চট্টগ্রাম এ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কালো পতাকা উচিয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়কে বের হয় মিছিল। বিক্ষুব্ধ জনতার সব মিছিল এসে জামাল খান রোডে জড়ো হয়। হত্যাকান্ডের পর থেকে জামাল খান সড়কে যানবাহন চলচল বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রতিবাদ আর মিছিলের জনপদে পরিণত হয়।

ছবি Ref- চাদরটা সরিয়ে দাও
ছবি Ref- Rape of a nation.

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ২-৬ অক্টোবর/২০০১ এবং ১৭ ই অক্টোবর/২০০১ ইং তারিখে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন শমসের নগর বাজার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়ে এবং শমসেরনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নারকীয় ধ্বংসলীলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ সংক্রান্তে ঃ

গত ১লা অক্টোবর/২০০১ চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি জামায়াত সন্ত্রাসীরা ২, ৩, ৪, ৫, ৬ অক্টোবর/২০০১ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও স্কুল কলেজের ফার্নিচার পত্র রিক্সা, ভ্যান, নছিমন করিমনে করে লুটপাট করে নিয়ে যায়। তারা বুড়ি-ভৈরব নদীর উপর কাঠের ব্রীজটি ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় যাতে কেউ প্রতিরোধ করতে না পারে। সন্ত্রাসীরা ওয়াজেদ আলী, পিতা- মোহাম্মদ ওয়াহেদ আলীকে দোকান থেকে বের করে টাকাসহ মালামাল লুট করে। ওয়াজেদ আলীর ঐ বাজারে একটি মুদি দোকান, ০১টি সার ও কীটনাশকের দোকান এবং ০১টি ডেকোরেটরের দোকান ছিল। এছাড়াও শাহজাহানের ০১টি সাইকেল পার্টসের দোকানও লুটপাট করে। সন্ত্রাসীরা তাদের সাথে আনা রামদা, চাইনিজ কুড়াল, সাবল, হাতুড়ী, লাঠি, লোহার রড দিয়ে দোকান পাট ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীরা মোঃ শাহাদাত খা, পিতা-ওসমান খাঁ, সাং-সাতগাছিয়া, থানা-কালীগঞ্জের বাড়ীঘর ভাংচুর ও তাকে মারধর করে সন্ত্রাসীদের আক্রমনে বাজারটি নিশ্চিন্ন হয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা বঙ্গবন্ধু নামের কলেজ থাকায় উক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মহাবিদ্যালয়টি ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।

এছাড়াও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দোকান ও প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ঃ

১। ডাঃ রাশেদ শমসের, পিতা- মৃত ডাঃ শমসের আলী ঃ পাকা মার্কেট ও ঔষধের দোকান লুট, মেহগনি গাছ কেটে নেয়া।

২। মোঃ তরিকুল ইসলাম, পিতা-মৃত ডাঃ শমসের আলী ঃ পাকা মার্কেট ভাংচুর, মুদি দোকান লুটপাট।

৩। মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা-মৃত ডাঃ শমসের আলী ঃ রাইচ মিলের ইঞ্জিন লুট, বিল্ডিং ভাংচুর, ধান চাল লুট।

৪। মোঃ লাভলু, পিতা-মৃত ডাঃ শমসের আলী ঃ দোকান ভাংচুর ও মুদি দোকান লুটপাট।

৫। ডাঃ বাবুল আকতার, পিতা-মৃত ডাঃ শমসের আলী ঃ ঔষধের দোকান লুটপাট ও ভাংচুর।

৬। ডাঃ আজিজ, পিতা-মৃত বাবর আলী বিশ্বাস ঃ পাকা মার্কেট ভাংচুর, সার কীটনাশক লুটপাট।

৭। মোঃ টিপু সুলতান, পিতা- মোঃ সামছুদ্দিন, পাকা দোকান ভাংচুর, সার কীটনাশক লুটপাট।

৮। মোঃ শরিফুল ইসলাম, পিতা-মৃত ডাঃ শমসের আলী ঃ দোকান ভাংচুর।

৯। শ্রী পরিতোষ ঘোষ, পিতা- পূর্ণ ঘোষ, ভুসি মালের ব্যবসায়ী, তরিকুল ইসলামের ভাড়াটিয়া, ধান-চাল, চলা, মুশুরী লুটপাট।

১০। শহিদুলসহ আট ভাই, পিতা-মৃত ডাঃ শমসের আলী, মাঠের ফসল লুটপাট।

১১। শমসের নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভাংচুর, ফার্নিচার পত্র লুটপাট।

১২। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেমোরিয়াল মহাবিদ্যালয়ের ফার্নিচার, অবকাঠামো ভাংচুর ও লুটপাট।

লালমোহন উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের জাহাজমারা গ্রামের অন্তঃসত্তা জয়ন্তী-সংগ্রামের কাহিনী ঃ-

বিএনপি সন্ত্রাসীর দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার ভয়ে পলায়নরত অবস্থায় ধানক্ষেত্রে সন্তান প্রসব

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখ অষ্টাদশী গ্রাম্য গৃহবধু জয়ন্তী যখন তার প্রথম সন্তানের জন্মমুহূর্তে প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে দিন দুপুরেই বেলা আনুমানিক তিনটায় ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার সাত নম্বর পশ্চিম চর উমেদ ইউনিয়নের জাহাজমারা গ্রামে হামলা চালায়। স্থানীয় বিএনপি নেতা ইলিশা কান্দি গ্রামের জাহাঙ্গীর মাতবরের নেতৃত্বে অর্ধ শতাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী দা, ছুরি, লাঠি ও বল্লমসহ হামলা চালায় তাদের কুঁড়ে ঘরে। হামলায় গ্রামবাসী ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকেন। গ্রামের বিভিন্ন ঘরে ঢুকে সন্ত্রাসীরা লুটপাট ও হামলা চালায়। জয়ন্তীর শ্বাশুড়ী মুক্তিরাণী একজন স্থানীয় ধাত্রীকে দিয়ে জয়ন্তীর শিশু প্রসব করাচ্ছিলেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা দা ও ছুরি দিয়ে কোপ মারে তাদের ঘরের বেড়ায়। সন্ত্রাসীদের আতংকে পালিয়ে যান ধাত্রী। ঘরে শুধু অসহায় জয়ন্তী ও শ্বাশুড়ী সন্ত্রাসীরা তখনো নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বেড়া ভেংগে ঢোকার। এসব ঘটনার মধ্যে জন্ম নেয় একটি পুত্র সন্তান। হতবুদ্ধি মুক্তিরাণী তখন কোন উপায় না দেখে জয়ন্তীকে ভালভাবে জড়িয়ে ধরে নবজাতককে পরনের শাড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়ে ঘরের অপর কোণায় বেড়া ভেঙে জয়ন্তীকে টেনে-হিচড়ে বের করে আনেন। এর পর ওই অবস্থাতেই দৌড়ে পালান পাশের ধানক্ষেতের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। সদ্য প্রসূতি মা জয়ন্তীর তখন দৌড়ে পালানোর মতো অবস্থা ছিলনা। কিন্তু মৃত্যুভয়ে ভীত মুক্তি রাণী তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। **তখন পর্যন্ত সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের নাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করারও সময় পাননি বলে মুক্তিরাণী জানান।** তাদের মতো আরো অনেকেই সেই ধানক্ষেতের মাঝে অপেক্ষাকৃত উচু একটি জায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এসে জড়ো হয়েছিল। **সেখানেই একজনের কাছ থেকে একটি ব্লেড সংগ্রহ করে নাড়ি কাটেন মুক্তিরাণী।** রাত নয়টা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের ভয়ে একটি গাছের নিচে সদ্য ভুমিষ্ট শিশুসহ বসে ছিলেন তারা। পরে সন্ত্রাসীদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার খবর শুনে পুনরায় ঘরে ফিরে যান। সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের নাম রাখা হয় সংগ্রাম।

পালিয়ে থেকেও বাচঁতে পারলো না গৌরনদী কলেজ ছাত্রলীগ নেতা শফিকুর রহমান বুলেট ঃ-

ঘটনাস্থল ঃ বরিশালের গৌরনদী।

অনুসন্ধানে জানা যায় ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গৌরনদী ও আগৈলঝড়া উপজেলার সংখ্যালঘু নারী পুরুষের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই পালিয়ে বেড়ায়। গৌরনদী কলেজের ছাত্রলীগ নেতা শফিকুর রহমান বুলেট বেশ কিছু দিন পালিয়ে থেকে বাড়ী ফেরার পর তার অসুস্থ্য মায়ের ঔষুধ কেনার জন্য বাড়ী থেকে বের হয় । গৌরনদী গোপাল শীলের সেলুন থেকে বিএনপি ক্যাডার কালু, সেলিম, মাসুদ, সুমন, রুবেল, স্বপন, বাবু সহ ১০/১২ জন তাকে ধরে নিয়ে যায় শহরের খাদ্য গুদামের কাছে সেখানে তার উপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন চলে এক পর্যায়ে বুলেট প্রানে বাচঁতে পার্শ্ববর্তী খালে ঝাপিয়ে পড়ে। বিএনপি ক্যাডাররা তাকে পানিতে চুবিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। শফিকুর রহমান বাড়ীতে ২ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তার অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তাকে শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় সে মারা যায়। এ ব্যাপারে গৌরনদী থানার মামলা নং-০৬, তারিখ-২৬-১১-২০০১ ইং ধারা- ৩০২/৩৪ দঃ বিঃ রুজু হয়। তদন্ত শেষে আসামী ১। মাসুদ ওরফে হকার মাসুদ, পিতা- মধু মিয়া হাওলাদার, সাং- চরগাধাতলী, ২। রুবেল, পিতা- আব্দুর রহিম, ৩। স্বপন ওরফে ছোট স্বপন, পিতা- সেকান্দার কুলি ওরফে কুদ্দা ওরফে সেকান্দার আলী বয়াতী, সাং- চরগাধাতলী, ৪। সজল, পিতা- মধু মিয়া হাওলাদার, সাং- চরগাধাতলী, ৫। সুমন কর্মকার, পিতা- অজ্ঞাত, সাং- চরগাধাতলী, ৬। বাবু ওরফে শামীম মোল্লা, পিতা- মৃত হাতেম মোল্লা, সাং- টিকাসার, ৭। জুয়েল, পিতা- মৃত বদিকুল ইসলাম খলিফা, সাং- কাশেমাবাদ, ৮। শাহ আলমস খান, পিতা-জসিম উদ্দিন খান, সাং-টিকাসার, সর্ব থানা-গৌরনদী, বরিশালদের বিরুদ্ধে গৌরনদী থানার অভিযোগ পত্র নং-১৫, তারিখ-২৬/০১/২০০২ ইং-আদালতে দাখিল করা হয়।

নির্বাচনী সহিংসতা চরফ্যাশন, ভোলার চিত্র ঃ

দ্বীপ জেলা ভোলার এই থানায় ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর হইতে প্রায় ০২ মাস যাবৎ আওয়ামীলীগ কর্মী-সমর্থক বিশেষ করিয়া সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতন চলে। যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের লোকজন এমনকি সংবাদ কর্মীরাও নির্যাতনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। বাড়ীঘর লুটপাট, চাঁদাদাবী এমনকি নারী ধর্ষণের অজস্র ঘটনা ঘটে। এসবের অধিকাংশই পুলিশের নথিভুক্ত হয় নাই। ভুক্তভুগীরা ভয়ে কোন অভিযোগ পর্যন্ত করেন নাই। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লোক লজ্জা ও সামাজিক ভাবে হেয় হওয়ার ভয়ে পরিবারের মহিলারা ধর্ষিত হওয়ার পরও আইনের আশ্রয় নেয়নি বা বিষয়গুলি গোপন রেখেছেন। স্থানীয় লোকজন/প্রতিবেশীরা বিষয়টি জানিলেও/অনুমান করিলেও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকার করেন নাই অথবা মৌন ছিলেন। ঘটনার ০৯ বছর পর তদন্ত কমিশন এলাকা বাসীর সাথে কথা বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন অনেকের নির্যাতনের কাহিনী। ভুক্তভুগীদের অনেকে ঘটনার কথা স্বীকার করিলেও কোন প্রকার লিখিত বক্তব্য বা স্বাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। এমনকি সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হইবেন বলিয়া তাহাদের নাম ঠিকানা গোপন রাখার অনুরোধ করেন। চরফ্যাশন থানার কিছু বর্বরতার খন্ডচিত্র এখানে বর্ণিত হলো ঃ

(ক) অমীয় রাণী দাস, স্বামী- টিকেন্দ্র চন্দ্র দাস ওরফে আইচা রাম দাস, সাং- উত্তর চরফ্যাশন, ইউ,পি-ওসমানগঞ্জ, থানা- চরফ্যাশন, বর্তমানে বাড়ীঘর বিক্রি করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেছেন (ঢাকার ঠিকানা সংগ্রহ করা যায়নি)। নির্বাচনের প্রায় ০১ মাস পর চারদলীয় জোটের কিছু সন্ত্রাসী রাতে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। সন্ত্রাসীরা দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া তার কন্যা শিল্পীকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা শুরু হওয়ার পর শিল্পীর পিতা-মাতা তাকে দাসকান্দি গ্রামে তার চাচার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়ায় সন্ত্রাসীরা তাকে পায় নাই। তবে সন্ত্রাসীরা তার বাড়ীঘর লুটপাট করে মূল্যবান সামগ্রী নিয়া যায় তারপর প্রায় ০২ মাস এই পরিবারটি বাড়ী ছাড়া ছিল।

(খ) সোভা রাণী দাস, স্বামী- রঞ্জন কুমার দাস, সাং- উত্তর চরফ্যাশন, থানা- চরফ্যাশন জানান নির্বাচনের পরপরই কিছু সন্ত্রাসী তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে নগদ ১৭,০০০/- (সতের হাজার) টাকাসহ মালামাল লুট করিয়া নিয়া যায় এবং তাহাকে মারপিট করে ডান হাত ভাঙ্গিয়া দেয়। শারীরিকভাবে লাঞ্চিত হইলেও ধর্ষণের কথা স্বীকার করেন নাই শোভা রাণী দাস। এ ব্যাপারে তখনও কোন অভিযোগ করেন নাই এবং বর্তমানে করতে রাজি নন। তার কথা বার্তায় প্রতীয়মান হয় সন্ত্রাসীদের অনেকেই তিনি চেনেন কিন্তু নাম বলেননি। তিনি আরও বলেন আশপাশের হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সব বাড়ীতেই লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে এবং অনেক মহিলা ধর্ষিত হয়েছে।

(গ) আরতী বালা রায়, স্বামী-সুনীল কুমার রায়, সাং- উত্তর চরফ্যাশন, থানা- চরফ্যাশন জানান নির্বাচনের পর লুটপাট ও অত্যাচার শুরু হলে তারা বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। ঘরের তেমন কিছু ক্ষতি না হলেও ৩৫টি হাঁস সন্ত্রাসীরা নিয়ে যায়। আরতী রাণীর বক্তব্যে বোঝা যায় পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে এলাকায় ফিরে জানতে পারে শোভা রাণী সন্ত্রাসীদের দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছিলেন।

(ঘ) সুজলা রাণী দাস, স্বামী-অবিনাশ কুমার দাস সম্পর্কে জানা যায় নির্বাচনের পর সন্ত্রাসীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার কয়েক মাস পর তারা বাড়ীঘর ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছে। বর্তমানেও তারা ভারতে অবস্থান করছেন। তাদের বাড়ীতে দুইবার আক্রমন হয়। সন্ত্রাসীরা মহিলার নাকফুল নিয়ে যায়। প্রতিটি ঘরে ঢুকে তল্লাশী করে এবং সোনার গহনা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগলসহ মূল্যবান জিনিষপত্র লুটপাট করে। উল্লেখ্য ঐ এলাকায়

নাকফুল নেওয়া বলিতে মহিলার সম্ভ্রমহানী বুঝায় বলে এলাকাবাসী জানান। পরিবারের অনেক সদস্য ভয়ে ধান ক্ষেত্রে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং জোকের কামড়ের শিকার হয়। সন্ত্রাসীরা মূলত সন্ধার পর বাড়ীঘরে আক্রমন শুরু করিত। এই পরিবারটি ক্ষোভে, লজ্জায় বাড়ীঘর ছেড়ে ভারত চলে যায় এবং আজও ফিরে আসেনি। উল্লেখ্য, ঘটনার পর কান্নাকাটি ও চিৎকার শুনে আশপাশের মুসলিম পরিবারের লোকজন প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে।

(ঙ) কনিকা রাণী দাস, স্বামী-বলরাম রাণী দাস, সাং- উত্তর চরফ্যাশন, ইউ,পি-ওসমানগঞ্জ, (ওয়ার্ড নং-২), থানা- চরফ্যাশন এর ব্যাপারে জানা যায় তাদের বাড়ীতে ০৩/১০/২০০১ তারিখ একদল সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমন করে মালামাল লুটপাট করে নাকফুল ও কানের দুলসহ বিভিন্ন মালামাল নিয়ে যায়। সে ও তার স্বামীকে মারধর করে । পুলিশকে কিছু না জানানোর জন্য শাসায়। ঘটনার ব্যাপারে থানায় কোন অভিযোগ করেনি। এমনকি কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের নাম বলতেও রাজি হয়নি।

(চ) কল্যাণী দাস (৩০), স্বামী- অমর চন্দ্র দাস, সাং- উত্তর চরফ্যাশন সম্পর্কে জানা যায়, সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়ীতে আসিয়া ধান-চাল, জামা-কাপড়সহ বাড়ীর সকল মূল্যবান জিনিষপত্র লুট করে নেয়। তারা তার মেয়ের খোঁজ করতে থাকে এবং তাদের হাতে তুলিয়া দিতে বলে। কল্যাণী সন্ত্রাসীদের জানায় তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বাড়ীতে নেই। তখন সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে তার স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে। স্বামী বাধা দিতে গেলে তাকে মারপিট করে বলে জানা যায়। তারা ব্যাপারে স্থানীয় তদন্তকালে কল্যাণী বাড়ীঘর লুটপাট, তাকে ও স্বামীকে মারধরের কথা স্বীকার করলেও ধর্ষণের কোন ঘটনা ঘটেনি বলে জানান। এই ব্যাপারে তারা থানায় কোন অভিযোগ করেননি। আসামীদের নাম বলতেও অস্বীকৃতি জানান।

(ছ) শেফালী রাণী দাস (৩৫) স্বামী- সন্তোষ কুমার দাস, সাং- উত্তর চরফ্যাশনদের বাড়ীতে ০৩/১০/২০০১ রাতে ২০/২৫ জনের একটি সন্ত্রাসীদল প্রবেশ করে। পরিবারের লোকজন আক্রমনের বিষয়টি টের পেয়ে নিকটবর্তী বাজারে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে। সন্ত্রাসীরা বাড়ীর মূল্যবান জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে যায়। তারা চলে গেলে বাড়ীতে ফিরে আসে। কিন্তু রাতে আবার একদল সন্ত্রাসী আক্রমন করে এবং স্বামী-স্ত্রী দুজনকে বেদম মারপিট করে এবং অবশিষ্ট মালামাল লুটপাট করে। ২য় দফায় সন্ত্রাসীরা মুখে কাপড় বেধে আসে যাতে তাদেরকে চেনা না যায় তারা এই ব্যাপারে কোন মামলা করেনি। নির্বাচনের কয়েক মাস পর পরিবারের সবাই ভারতে চলে গিয়েছে।

(জ) এছাড়াও (১) প্রকৃতি রাণী দাস, স্বামী- লিটন দাস, (২) রীতা রাণী দাস, স্বামী- সুব্রত দাস, (৩) শোভা রাণী দাস, স্বামী-নিরঞ্জন দাস, (৪) শেফালী রাণী দাস, স্বামী- সন্তোষ কুমার দাস, সর্বসাং- দশনাথ আলীগাঁও, উত্তর চরফ্যাশন, কর্তারহাট-গত ২০০১ সনের নির্বাচনের পর নির্যাতনের কারণে ক্ষোভে, ভয়ে লজ্জায় দেশ-ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। ঝর্না রাণী দাস , স্বামী-সুনীল কুমার দাস, সাং-দশনাথ আলীগাঁও, বাড়ীঘর ছেড়ে বর্তমানে ঢাকায় বসবাস করছেন বলে এলাকাবাসী জানায়। উল্লেখিত ব্যক্তিদের বাড়ীতে বর্তমানে কেহ বসবাস করে না। স্থানীয় ভাবে জানা যায় নির্বাচনের পর পর চরদলীয় জোটের সন্ত্রাসীরা বাড়ীতে ব্যাপক লুটপাট ও মারধর করে। বাড়ীর মহিলারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলেও এলাকাবাসী জানায়। এই কারণে লজ্জায় ক্ষোভে বাড়ীঘর ত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করছেন। এদের কেহই থানায় অভিযোগ করেনি। এলাকায় অনেক পরিবারই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বীকার হয়েছেন। কিন্তু ভয়ে কিংবা পুনরায় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হইলে আক্রমনের শিকার হতে হবে বলে অধিকাংশ ভুক্তভুগী অভিযোগ করছেন না, পূর্বেও করেননি।

সংখ্যালঘু দুই গৃহবধুকে ধর্ষণ। সর্বস্ব হারিয়ে ৫০টি পরিবার গ্রাম ছাড়া ঃ-
ঘটনাস্থল ঃ ফেণীর দাগন ভূঞা

গত ১৫/০২/২০০২ তারিখ রাত ১২ টার দিকে মাতুভুঞা ইউনিয়নের উত্তর চানপুর গ্রামের আবুল হোসেনের পুত্র বহু অভিযোগের আসামী **সন্ত্রাসী হারুনের** নেতৃত্বে ১৫/২০ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল মহেশপুর গ্রামে সংখ্যালঘু দাসপাড়াতে ধর্ষণ, হামলা ও লুটপাট চালায়। ভোর ৪ টা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের নারকীয় তান্ডবে জয়বিহারী দাসের বাড়ি, ডাক্তার বাড়িসহ বিভিন্ন বাড়ির লোকজন দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় সন্ত্রাসীদের একটি গ্রুপ তিন সন্তানের জননী পুতুল রাণী দাসকে (৩২) তাঁর স্বামী-পুত্রের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পুতুল বলেন, আমি আমার ইজ্জত রক্ষার জন্য সন্ত্রাসী হারুনের হাতে এক হাজার টাকা দিয়েও সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেনি। চাঁনপুর গ্রামের ফারুক, শাহআলম ও মোঃ ইউনুস একই সময় হেমন্ত কুমার দাসের স্ত্রী আলো রাণীকে ও ধর্ষণ করে।

বিএনপি সন্ত্রাসী কর্তৃক শ্রীপুর থানা এবং আওয়ামী লীগ অফিস সহ প্রতিমন্ত্রীর বাড়ী ভাংচুর ঃ
ঘটনাস্থল ঃ গাজীপুর

গত ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পরে ১লা ডিসেম্বর/০১ তারিখে জননিরাপত্তা আইন বাতিলের প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর বোন শেখ রেহানার ক্ষতির আশংকায় তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী (বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী) বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে তানজিম আহম্মেদ সোহেল তাজ এম,পি এবং রহমত আলী (সাবেক প্রতিমন্ত্রী)এম,পি দ্বয় যথাক্রমে কাপাসিয়া থানায় এবং শ্রীপুর থানায় পৃথক দুইটি সাধারণ ডাইরী করেন। উক্ত ডাইরীর বিষয় প্রকাশ পেলে স্থানীয় বিএনপি নেতা মাওলানা রুহুল আমীনের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী (বিএনপি সমর্থিত) স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিস, সাবেক প্রতি মন্ত্রী বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব রহমত আলীর বাড়ী এবং শ্রীপুর থানা অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এমনকি তারা শ্রীপুর থানা অফিসে ঢুকে ভাংচুর করে । থানা পুলিশ অসহায় অবস্থায় পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় আওয়ামীলীগ অর্ধবেলা হরতাল আহ্বান করে এবং ঢাকা ময়মনসিংহ রোডে সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে।

বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার গোপালপুর গ্রামে-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৬ জন গণধর্ষণের শিকার ঃ-

গত ১৬/১১/২০০১ তারিখ বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার গোপালপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের **১ জন বালিকাসহ ০৫ জন মহিলাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে**। নির্যাতিতরা জানান তারা এ ঘটনা ভয়ে প্রকাশ করেননি। কারণ সন্ত্রাসীরা তাদের হুমকি দিয়ে গেছে, যদি এই ঘটনা ফাঁস হয় অথবা পুলিশকে জানানো হয় তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তারা জানান, মধ্যরাতে সন্ত্রাসীরা ৫টি ঘরে প্রবেশ করে এবং ১১ বছরের একজন বালিকাসহ ৫ জন মহিলাকে গণধর্ষণ করে স্বর্ণের অলংকার ও মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীদের এই গণধর্ষণের হাত থেকে গর্ভবতী মহিলাও রক্ষা পয়নি। নির্যাতিতার স্বামী গর্ভবতী স্ত্রীকে ধর্ষণ না করার জন্য ৬ হাজার টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ঘরবাড়ী ছেড়ে যেতে বলেছে।

মাগুরা জেলা দুই সংখ্যালঘু তরুনীর ইজ্জতের মূল্য ১৯ হাজার ৫ শত টাকা ঃ
ঘটনাস্থল ঃ মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার নহাটা গ্রাম

নির্বাচন পরবর্তী ৯ অক্টোবর ২০০১ রাতে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার সন্দালপুর ইউনিয়নের নহাটা গ্রামের পালপাড়ায় পাশের গ্রামের বাকি মিয়ার নেতৃত্বে ১। মিজানুর রহমান, ২। জাহাঙ্গীর, ৩। বাবলু, ৪। আবু সাইদ ৫। কেনাল সহ ২০/২৫ জন বিএনপি জোট সন্ত্রাসী ঐ গ্রামের অনিল পাল, নিখিল পালসহ কয়েকজনের বাড়ীতে ভাংচুর মারপিট ও লুটপাট করার এক পর্যায়ে কলেজ ও স্কুল পড়ুয়া দুই তরুনীকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী মাঠে রাতভর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পরের দিন সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে নারী শিশু নিঃ ধারায় মামলা হয় এবং তদন্ত শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়। ১২ এপ্রিল ২০০২ পার্শ্ববর্তী আমতৈল দাখিল মাদ্রাসায় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ঘটনাটি আপোস মিমাংশা করার জন্য এক শালিসী বৈঠকে বসেন এবং উক্ত সালিশগণ নির্যাতিত দুই তরুনীর ইজ্জতের মুল্য ১৯ হাজার ৫ শত টাকা নির্ধারণ করেন।

পুড়িয়ে হত্যা করা হলো একই পরিবারের ১১ (এগার) জন অসহায় জীবনকে
ঘটনাস্থল ঃ চট্টগ্রামের বাঁশখালী

শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম সাধনপুর। শীলপাড়ায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর বসবাস। বিএনপি নেতা আমিনুর রহমান চৌধুরী স্থানীয় চেয়ারম্যান। আমিন চেয়ারম্যান নামে খ্যাত। তার চাচাত ভাই জাফরুল ইসলাম চৌধুরী সরকারের প্রতিমন্ত্রী। আমিন সাম্প্রদায়িক চেতনা লালনকারী দখলবাজ হিসেবে পরিচিত। ২০০৩ সালের ১৮ নভেম্বর রাত ১২.৩০ ঘটিকায় আমিন চেয়ারম্যানের নির্দেশে সন্ত্রাসীরা দাহ্য পদার্থ ঢেলে ডাক্তার বিমল শীলের বসত ভিটায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখায় জীবন্ত দগ্ধ হয় শীল পরিবারের ১১ (এগার) জন সদস্য। এই নৃশংসতায় নিহত হয় অনীল শীল, রুমি শীল, সোনিয়া শীল, বকুল বালা শীল, তেজেন্দ্র শীল, দেবেন্দ্র শীল, বাবু শীল, প্রসাদ শীল, এনি শীলসহ সদ্য ভূমিষ্ট চারদিন বয়সের দুগ্ধ পোষ্য শিশু কার্তিক শীল। নির্মম, পৈশাচিক এই হত্যাকান্ড। উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা এবং ভয়ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে বাধ্য করে সম্পত্তি দখল।

রাজনৈতিক প্রভাবে মূল আসামী আমিন চেয়ারম্যান ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের বারংবার বদলের পর সম্প্রতি মূল হোতা আমিন চেয়ারম্যানসহ ৩৯ (উন চল্লিশ) জনকে আসামী করে সিআইডি চার্জসিট দাখিল করেছে। বাদী ডাক্তার বিমল শীল ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায় অপেক্ষারত।

মা মেয়েসহ একই পরিবারের তিন নারীকে পালাক্রমে গণধর্ষণ ও একজনকে হত্যা
ঘটনাস্থল বাগেরহাট সদর উপজেলা।

যাত্রাপুর ইউনিয়নের করমপুর গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতা নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। গত ০৮/০৩/২০০৩ তারিখে স্থানীয় বিএনপি দলীয় ক্যাডার কামরুলের নেতৃত্বে ১০ জন সন্ত্রাসী নিরঞ্জনকে হত্যার উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে নিরঞ্জনের ভাই তপনের স্ত্রী অনিমা সজাগ থাকায় সে স্বামী তপন ভট্টাচার্যকে ডাক দিলে তপনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে রান্না ঘরের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে সন্ত্রাসীরা তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপ দিয়ে রক্তাক্ত জখম করে হত্যা করে। অপর ভাই স্বপন ভট্টাচার্য ও সন্ত্রাসীদের আক্রমনে গুরুতর আহত হয়। সন্ত্রাসীরা তপনের স্ত্রী অনিমা, স্বপনের স্ত্রী শ্যামলী ও তার মা নমিতা রায়কে একটি ঘরে আবদ্ধ করে পৈশাচিক কায়দায় পালাক্রমে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। নিরঞ্জন ঘটনাক্রমে স্ত্রীসহ শশুর বাড়ীতে অবস্থান করায় প্রাণে রক্ষা পায়। সন্ত্রাসীরা বাড়ীর মূল্যবান সামগ্রী স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করে নেয়। নিরঞ্জন ও তার স্ত্রী জানায় যে, ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কারণে তাদের পরিবারকে সন্ত্রাসীরা প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে আসছিলেন। বাগেরহাট সদর থানায় মামলা হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ- কমিশনের সদস্যগণ সরেজমিনে বাগেরহাট পরিদর্শনকালে স্থাণীয় জনগণ ঘটনাটি জানায়।

এক পরিবারের তিন সংখ্যালঘু নারীর সম্ভ্রম হানী ঃ
ঘটনাস্থল ঃ বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই ইউনিয়নের রাজারচর গ্রামে

বরিশাল সদর থানার চরমোনাই ইউনিয়নের রাজারচর গ্রামে তিন সংখ্যালু নারীকে ধর্ষণ করা হয়। অনুসন্ধান কালে জানা যায় রাজারচর গ্রামের পবিত্র কুমার মিস্ত্রি পিতা-মৃত-রজনী কান্ত মিস্ত্রি, হোগলা পাতার ব্যবসা করতেন। দুই ছেলে, দুই মেয়ে, বোন আর স্ত্রীকে নিয়ে রাজারচর বাড়ীতে বসবাস করতেন, নির্বাচনের পর গ্রামে সন্ত্রাসীদের দাপট বেড়ে যাওয়ায় বড় মেয়ে গৌরীকে তিনি শহরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন, এভাবে আগাম সতর্ক হওয়া সত্বেও সন্ত্রাসীদের কবল থেকে বাচাঁতে পারলোনা পবিত্র কুমার তাহার পরিবারের ইজ্জত ও অন্যান্য মালামাল । ইং ১০/১০/২০০১ তারিখ সকাল অনুমান ১১.০০ ঘটিকার সময় বিএনপি সন্ত্রাসী ১। বজলু, পিতা-মকবুল হাওলাদার, ২। আতাহার তালুকদার, পিতা-অজ্ঞাত, উভয় সাং-রাজারচর, থানা-কোতয়ালী, বরিশাল সহ আরো ১০/১২ জন অজ্ঞাত নামা সন্ত্রাসী পবিত্র কুমারের বাড়ীতে এসে তাকে সন্ধান করে না পেয়ে তার স্ত্রী সন্তানদের পরনের কাপড় ছাড়া সকল মালামাল নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় পবিত্র কুমার মিস্ত্রিকে তাদের সাথে দেখা করার জন্য বলে, পবিত্র কুমার প্রাণের ভয়ে দেখা না করায় সন্ত্রাসীরা পুনরায় ইং ১৩/১০/২০০১ তারিখ রাত অনুমান ০১.১০ মিনিট এর সময় পবিত্র কুমারের বাড়ী সিধ কেটে প্রবেশ করে দরজা ভেঙ্গে ফেলে পবিত্র কুমারের স্ত্রী পারুল বালা রাণী (৪০), মেয়ে প্রিয়ংকা রাণী মিস্ত্রি (পুস্প)১৪, চাচাতো বোন সোমা রাণী মিস্ত্রি, পিতা-রাখাল চন্দ্র মিস্ত্রিদের-কে গণ ধর্ষণ করে, এ ব্যাপারে পবিত্র কুমার মিস্ত্রি বাদী হয়ে কোতয়ালী থানার মামলা নং-২৫, তারিখ-১৪/১০/২০০১,ধারা-নাঃ শিঃ নির্যাতন দমন আইন ১০০ এর ৯(১)৩ /৩০ রুজু হয়, মামলার এজহারে ১ নং আসামী হিসাবে বজলু, পিতা-মকবুল হাওলাদার, সাং-রাজারচর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-বরিশাল এর নাম উল্লেখ করা হয়, অন্যান্য আসামীদের নাম ঠিকানা না জানায় তাৎক্ষণিক ভাবে তারা আর কোন নাম দিতে পারেনি। মামলার পরে পুলিশ ১-নং আসামীকে গ্রেফতারপূর্বক তাকে আদালতে সোপর্দ করেন। অপর দিকে ঘটনাটি সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নয়, এটা প্রমাণের জন্য আসামীরা পরিকল্পিত ভাবে বাদীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ১। অনুকুল ভূইয়া, পিতা-রমান কান্ত ভূইয়া, ২। গোপি শিকদার, @ তাপস, পিতা-তপন শিকদার, উভয় সাং-রাজারচর , কোতয়ালী, বরিশালদের বিরুদ্ধে বাদীর মাধ্যমে অভিযোগ দিয়ে থানা পুলিশ কর্তৃক উল্লেখিত মামলায় গ্রেফতার করাতে বাধ্য করেন। এতেও আসামীরা ক্ষ্যান্ত না হয়ে মামলা হওয়ার কিছূ দিন পর বাদীর বাড়ীতে গিয়ে ভয়-ভীতি মামলা না চালানোর স্বীকারোক্তি হিসাবে ষ্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয়। পরবর্তীতে বাদী ও ভিকটিমরা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে মামলা প্রমাণ করতে অনীহা ও অসহযোগীতা করায় পুলিশ আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরে কোতয়ালী থানার এফ আর টি সং-৪৫, তারিখ-১১/০২/২০০২ বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করেন।

ঘটনার প্রায় ৯ বছর পরে ভিকটিমরা তদন্ত কমিশনের কাছে ঐ দিনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের বুকের মাঝে দীর্ঘ দিনের লালন করা লোমহর্ষক চাপা ব্যাথা চোখের পানির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। আজও তারা ন্যায় বিচারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন।

স্থানীয় সংসদ সদস্য হাফিজ ইব্রাহিমের নির্দেশে চর আনন্দ গ্রামের বজলুর রহমানকে
পিস্তলের খোঁচায় অন্ধ করে দিল বিএনপির সন্ত্রাসীরাঃ
ঘটনাস্থল ঃ ভোলা সদর উপজেলা।

বজলুর রহমান, পিতা- আসমত আরী ফকির (এখন অন্ধ)। তার অপরাধ ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার ঘরে আওয়ামীলীগ এর নির্বাচনী অফিস খোলা হয়েছিল । গত ১৪/০১/২০০২ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় তিনি তার দোকানে বসে থাকা অবস্থায় সিরাজ চেয়ারম্যান হঠাৎ তাকে গালিগালাজ করতে থাকে। সিরাজ চেয়ারম্যানের সাথে থাকা বিএনপি সন্ত্রাসী ১। মশু, পিতা- হাফেজ, ২। মালেক, পিতা- মৃত আব্দুল হাসেম, ৩। শরীফ, পিতা মোফাজ্জল, ৪। মোঃ নিজাম মুন্সী, পিতা- মোফাজ্জল, ৫। টুলু, পিতা- সফি হাওলাদার, ৬। সেলিম, পিতা- এসতেখার, ৭। নুরেআলম, পিতা- আব্দুর রশিদ মাষ্টার, ৮। নজরুল ইসলাম, পিতা- অজ্ঞাত, ৯। সিরাজ বেপারী, পিতা- মৃত নজির বেপারী, সর্বসাং- চর আনন্দ -৩, ৬নং ওয়ার্ড, ৯ ভোলা সদরগণ সহ ৪০/৪৫জন লোক দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্রসহ তাকে দোকান থেকে টেনে হিছড়ে বের করে নিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকে। সংবাদ পেয়ে ভিকটিমের মা এসে সিরাজ চেয়ারম্যানের পা ধরে ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চাইলে সিরাজ চেয়ারম্যানের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে বজলুর চোখের ভিতর খোচা মারে। প্রথমে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভতি করা হয়। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করা হলে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে তার দুটি চোখ পচে নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে তিনি অন্ধ। সন্ত্রাসীরা তার বসতবাড়ী ভাংচুর করে দোকানের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনার আগের দিন উল্লিখিত সন্ত্রাসীরা তার কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে এবং না দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ করল সন্ত্রাসীরা ভয়ে মামলা পর্যন্ত করল না ভূক্তভোগী পরিবার ঃ
ঘটনাস্থল ঃ ফরিদপুর ভাংগা থানা।

নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলার আজিমনগর গ্রামে একটি সংখ্যালঘু পরিবার বর্বরতম নির্যাতনের শিকার হয়েছে । ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে বিএনপি মৌলবাদী সমর্থকরা ওই পরিবারের বাড়ী ঘরে হামলা চালিয়ে মূল্যবান জিনিষপত্র লুটপাট করেই ক্ষান্ত হয়নি ঘরের মধ্যে সারারাত মদ খেয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মায়ের সামনেই নকুল মালোর কলেজ পড়ুয়া মেয়েকে ধর্ষণ করে। অনুসন্ধানে জানা গেছে ৬ ই অক্টোবর/২০০১ রাত অনুমান ৯ টার দিকে ভাংগা উপজেলার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেনের ভাই , পলাশ, মোঃ সেকেন, জামাল, এস্‌কেন, কামাল ও টেক্কা নামক সাত বিএনপি সমর্থক ও সন্ত্রাসী আজিমনগর গ্রামের ঐ সংখ্যালঘুর বাড়ীতে হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা নৌকায় ভোট দেয়ার মজা দেখাচ্ছি বলে পরিবারের কর্তাকে খুজতে থাকলে প্রাণভয়ে তিনি ঘরের পিছনের দরজা খুলে পালিয়ে যান। এসময় সন্ত্রাসীরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় মায়ের সামনেই ওই পরিবারের কলেজ পড়ুয়া কন্যাকে সম্পুর্ণ উলংগ করে ধর্ষণ করতে শুরু করে। মা সন্ত্রাসীদের হাতে পায়ে ধরে মেয়ের ইজ্জত ভিক্ষা চাইলে সন্ত্রাসীরা তাকেও বেদম মারপিট করে। রাত ১ টা পর্যন্ত এ পৈশাচিক নির্যাতন শেষে সন্ত্রাসীরা ঘরের দামি জিনিষপত্র লুট করে ওই কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীকে বাড়ী থেকে অন্যত্র নিয়ে পুনরায় ধর্ষণ করে এবং ভোর রাতে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় বাড়ীর সামনে ফেলে যায়। ভোর রাতেই ওই পরিবারটি ধর্ষিত মেয়ে সহ গোপালগঞ্জ জেলার টুংগি পাড়ায় পালিয়ে যায়। ঘটনার সংবাদ পেয়ে পুলিশ গোপালগঞ্জ থেকে সংখ্যালঘু পরিবারটিকে এলাকায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েটিকে তার এক আত্মীয় বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা ঘটনার পর থেকে ওই পরিবারসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু পরিবারকে এ ঘটনা পুলিশ বা অন্য কাউকে জানালে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। সন্ত্রাসীরা এলাকায় প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খোলার সাহস পায় না। অন্য দিকে পুলিশ মামলা নিতে চাইলেও পুনরায় হামলা ও লোকলজ্জার ভয়ে থানায় মামলা দায়ের করতে রাজী হয়নি ওই পরিবারের কেউ। ভাংগা সার্কেলের তৎকালীন এএসপি রেজাউল করিম সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মামলা দায়েরের পরামর্শ দেন। ভিকটিম পরিবার ভয়ে অভিযোগ না করায় পুলিশ বিষয়টি সাধারণ ডায়েরী ভুক্ত করেন। ঘটনাটি দীর্ঘ দশ বছর পূর্বের ঘটনা হওয়ায় তদন্ত কমিশন থানার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাহেবের সহযোগিতা নিয়েও জিডি নং অথবা জিডির কপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়নি।

উল্লেখ্য যে ধর্ষিতার পরিবারের অনুরোধে ধর্ষিতার নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা হলো।

" রামশীল যেন হয়ে উঠেছিল নির্যাতিত ও ঘরছাড়া মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। "

গোপালগঞ্জ জেলাস্থ কোটালীপাড়া থানার রামশীল একটি দূর্গম ও প্রত্যন্ত গ্রাম। কোটালীপাড়া থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ। রামশীল এলাকায় শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। ১লা অক্টোবর /২০০১ এর নির্বাচনের পরদিন থেকেই রামশীলের প্রায় সব বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল পার্শ্ববর্তী থানা/এলাকা থেকে নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা। রামশীল এলাকা হিন্দু অধ্যুসিত হওয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই এলাকাকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়। নিজ এলাকার ঘরবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হওয়া শত শত নারী, পুরুষ ও শিশুদের মধ্যে যাদের নির্যাতন করা হয় তাদের কয়েকজন বরিশালের আগৈলঝড়ার রাজিহাড়ি ইউনিয়নের তৎকালীন সদস্য কমলা রাণী রায়, শেফালী রাণী সরকার, বাবুলাল মুন্সী, হরিহর রায়, রিয়াজ মোহন রায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, বাসুদেব রায়, দেবুরাজ রায়, শান্তি রঞ্জন রায়, বিজয় কৃষ্ণ রায়, শচিন্দ্রনাথ রায় প্রমূখ। এখানে আরো আশ্রয় নিয়েছিল গৌরনদী থানার উত্তর চাঁদসী, কাপালী, অশোক কাঠী ও আগৈলঝড়ার কোদাঁলদহ গ্রামের সহস্রাধিক পরিবারের মানুষ। এ রামশীলে আশ্রয় নিয়েছিল উজিরপুর থানা এলাকার নির্যাতিত পরিবারের সদস্যরাও।

বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট থানার জয়ঘা, চাঁদেরহাট, মাদারতলি, বুড়িগাংনি, বড়গাওলা, চাঘদা গ্রামের নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘু পরিবারের অনেক সদস্য রামশীলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। আশ্রয় নিয়েছিল স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন বাড়ীতে। রামশীল কলেজ ভবন ও সামনের মাঠ পরিণত হয়েছিল এক আশ্রয় শিবিরে। সংখ্যালঘু ও আওয়ামীলীগ সমর্থকরা আশ্রয় নিয়েছিল এই আশ্রয় শিবিরে। আশ্রয় নিয়েছিল গৌরনদী, আগৈলঝড়া, উজিরপুর বাগেরহাট থেকে পালিয়ে আসা ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মী সমর্থকরা। রামশীলে আশ্রয় নেওয়া আশ্রিতদের অনেককেই চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। নির্যাতিতদের অনেকেই প্রাণ ভয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে আসার সময় প্রয়োজনীয় অর্থ ও কাপড় চোপড় সঙ্গে আনতে পারেনি। আশ্রিতদের মধ্যে খাবারের অভাব ছিল প্রকট। গ্রামবাসী তাদের সাধ্য অনুযায়ী খাবার রান্না করে সকলে ভাগ করে খেয়েছে। প্রায় দিনই অনেককে এক আধবেলা উপোস করতে হয়েছে। আশ্রিতদের সঙ্গে আশ্রয়দাতারাও নিজেদের খাবার ভাগাভাগি করে খেয়েছে। যারা নির্যাতিত হয়েছিল তাদের চিকিৎসা সেবা ছিলনা বললেই চলে। সরকারী বা বেসরকারী কোন সাহায্যও তারা পায়নি। তদন্ত কমিশন তাদের কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে বহুল আলোচিত এই রামশীল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান শ্রী বিমল বিশ্বাস, বাবু কার্তিক চন্দ্র বাড়ৈ, প্রাক্তন মেম্বার রামশীল, বাবু নিত্যলাল বালা, প্রধান শিক্ষক, ডগলাস স্কুল, নবীন চন্দ্র রায়, (স্থানীয় মন্দিরের সেবায়েত), মৃনাল কান্তি হালাদার, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান, বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান অসীম বিশ্বাস, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান বাবু সচিন্দ্র নাথ, রামশীল কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেসর জয়দেব বালাসহ স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাথে মতবিনিময় করা হয়। মতবিনিময়কালে বাবু বিশ্বদেব রায়, পিতা মৃত ভূপেন চন্দ্র রায়, জানান তার বাড়িতে প্রায় ৩০ জনের মত আশ্রয় নিয়েছিল। তিনি তার দোতলা ঘর আশ্রিতদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার সাধ্যমত খাবার সরবরাহ করেছেন। বাবু নিহার রঞ্জন বাড়ৈ, পিতা বুমুদ রঞ্জন বাড়ৈ জানান নির্বাচনের পরাদিন হতেই আগৈলঝড়া এলাকা হতে নির্যাতিত লোকজন আসতে শুরু করে। ৪ঠা অক্টোবর ঘরবাড়ী ছাড়া নির্যাতিত মানুষের ঢল আশংকাজনকহারে বেড়ে যায়। তার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেশ চন্দ্র, রাজিহার ইউনিয়নের কমলা দেবীসহ অনেকে। তিনি কমিশনের নিকট কমলা দেবীর বাড়ীতে লুটপাট ও নির্যাতনের লোমহর্ষক কাহিনী তুলে ধরেন।

প্রাক্তন মেম্বর বাবু কার্তিক চন্দ্র রায়, প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাবু সচিন্দ্র সহ কয়েকজন মিলে আশ্রিতাদের থাকা, খাওয়া ও নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করেন। এ জন্য গঠিত হয়েছিল ২১ সদস্যের একটি কমিটি। মন্দিরের সেবায়েত নবীন চন্দ্র রায় জানান গৌরনদী, আগৈলঝড়া, উজিরপুর, বাগেরহাটের মোল্লারহাট এলাকা থেকে হিন্দু , মুসলমান, নির্বিশেষে হাজার হাজার নির্যাতিত মানুষ এই রামশীলে আশ্রয় নেয়। আশ্রিতদের মধ্যে অনেক মা-বোনই ধর্ষিত হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত। এলাকার প্রায় সবাই তাদের সাধ্য মত সাহায্য করেছে। আওয়ামীলীগ দলীয়ভাবেও রামশীলের আশ্রয় গ্রহনকারীদের সহায়তা করে। এক পর্যায়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫/১৬ মন চাউল খরচ হয়েছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সে সময় ব্যক্তিগতভাবে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এলাকাবাসীর ধারণা সব মিলিয়ে প্রায় ১৮/২০ হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছিল এই রামশীলে। রামশীল তখন হয়ে উঠেছিল আশপাশের এলাকার নির্যাতিত, ঘরবাড়ী ছাড়া আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী-সমর্থক ও সখ্যালঘুদের শেষ ভরসাস্থল।

শ্রী অশোক বৈদ্য, পিতা ইন্দ্র ভূষণ বৈদ্য কমিশনের সামনে ঐসময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে-''আমি ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি তবে শুনেছি পাক হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী। ৭১-এর নির্যাতন না দেখলেও জোট সরকারের সন্ত্রাসীদের ১লা অক্টোবরের নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা দেখেছি। এ নির্যাতন যেন ৭১-এর নির্যাতনকেও অনেক ক্ষেত্রে হার মানিয়েছে। রামশীলে অনেক মা-বোনকে দেখেছি নির্যাতিত অবস্থায়, অনেক শিশু খেতে পায়নি ঠিকমত। আমাদের বাড়ীতে প্রায় দুইশত আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। অনেক ধর্ষিতা মা-বোন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, আমরা তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত করেছি। নির্যাতিত মানুষের অসহায় মুখ ও বোবা কান্নার রোল যেন আজও রামশীলের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।''

স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে রামশীলে আশ্রয় গ্রহণকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ দেওয়া হয়েছিল নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য। এমনকি সংবাদ কর্মীদের কাছে নির্যাতনের বিষয়টি চেপে যাওয়ার জন্যও বলা হয়েছে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আলতাফ হোসেন চৌধুরীর রামশীল আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনের কথা ছিল বলে এলাকাবাসী জানান কিন্তু তিনি যাননি। ১২ অক্টোবর/২০০১ তারিখে তৎকালীন গোপালগঞ্জের ডিসি, বরিশালের ডিসি, এসপি আসেন রামশীলের আশ্রীতাদের খোঁজখবর নিতে। তারা ফিরে যেতে বলেন তাদের নিজ গ্রামে কিন্তু অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে কেহই বাড়ী ফিরে যেতে রাজি হননি। কারণ এরই মধ্যে যারা বাড়ী যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল তারা পথিমধ্যে কেউবা মার খেয়েছেন, কেউবা সন্ত্রাসীদের তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন, তাই কর্তা ব্যক্তিদের আশ্বাস সত্তেও কেউ রাজি হয়নি বাড়ী ফিরে যেতে।

আওয়ামীলীগ করার অপরাধে গোরস্থানেও ঠাঁই হলো না পাবনা সুজানগরের গুপিনপুর গ্রামের মুজিবর রহমানের

গত ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ০৪/১০/২০০১ ইং তারিখ বিএনপি-জোট সন্ত্রাসীরা সুজানগর উপজেলার গুপিনপুর গ্রামের ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জিয়াউর রহমান, পিতা-মৃত মুজিবর রহমানের বসতবাড়ী ভাংচুর, পুকুরের মাছ ও ঘরের সোনা-দানাসহ বিভিন্ন রকমের মালামাল লুট এবং বাড়ীর দুইটি টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরগুলো পুড়ে ভশ্মিভূত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা বাড়ীতে অবস্থান করে তার বাবাকে

শারীরিক ও অমানুষিক নির্যাতন করায় স্ট্রোক করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত পিতাকে ঐদিনই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরবর্তীতে ১৪/১০/২০০১ তারিখ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন মৃতদেহ গ্রামের বাড়ী গুপিনপুর গোরস্থানে দাফন করার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সুজানগর উপজেলার সাতবাড়ীয়া ইউনিয়নের তৎকালীন চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জনাব তোফাজ্জল হোসেন ও তার বাহিনী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে লাশটি স্থানীয় গোরস্থানে দাফন করতে দেয়নি। কোন উপায় অন্তর না দেখে অনোন্যপায় হয়ে পরবর্তীতে লাশটি বাড়ীর আঙ্গিনায় দাফন সম্পন্ন করা হয়। ২২/১০/২০০১ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় কুলখানি অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি নেয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব ডঃ মির্জা আব্দুল জলিলসহ শতশত মানুষ। কিন্তু তোফাজ্জল হোসেনের মেঝ ছেলের (মোঃ রবি) এর নেতৃত্বে তাদের দলীয় বাহিনী অনুষ্ঠানের সব খাবার ছিনিয়ে নেয় এবং শতশত মানুষের সামনে তার কবরের উপর প্রস্রাব করে। সন্ত্রাসীরা মৃত মুজিবর রহমানের স্ত্রী (মোসাঃ রাশেদা বানু) কে বেধড়ক মারধর করে আহত করে। থানায় মামলা করতে গেলে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা নেয়নি। কমিশন সরেজমিনে তদন্তকালে জানতে পারে যে স্থানীয় এম,পি সেলিম রেজা হাবীবের ইন্ধনে এই ঘটনা হয়েছে এবং এমপি সেলিম রেজা হাবীবের প্রভাবের কারণেই তখন থানায় মামলা নেয়া হয়নি।

২ সন্তানের সামনে মাকে অস্ত্রের মুখে গণধর্ষণ
ঘটনাস্থল ঃ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলা।

গ্রামের নাম খালিয়া। মানসিক প্রতিবন্ধী স্বামী, এক পুত্র, এক কন্যার সুখি সংসার তারামন বিবি ওরফে তারামন গাইন (৩৪)। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারনায় অংশ নেয়। একই গ্রামের বিএনপি ক্যাডার ১। শাজাহান, ২। বটু, ৩। ইসমাঈল ও সোবাহানের লোলুপ দৃষ্টির কারণে সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারে নাই তারামন বিবি। গত ১৫/০২/২০০২ তারিখে রাতে তারামন বিবি পুত্র কন্যার সম্মুখে ধর্ষিত হয়। ধর্ষিতা সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে ঘটনার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেয়। সন্ত্রাসী শাজাহান, বটু, ইসমাঈল ও সোবাহানের হুমকির মুখে প্রথমে আশাশুনি থানা মামলা নিতে অস্বীকার করে। পরে জনমতের চাপে মামলা হয়। মামলা প্রত্যাহার না করলে স্কুলগামী সন্তানকে হত্যার হুমকি। ন্যায় বিচার নিশ্চিত না হলে আত্মহত্যা করবেন দৃঢ় প্রত্যয়ী তারামন বিবি।

গলাচিপার হরিদেবপুরে মহিউদ্দিন বাহিনীর নির্যাতন ঃ

নির্বাচনের পরপরই গলাচিপা হয়ে উঠে সন্ত্রাসের জনপদ। আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘর হয়ে উঠে বিএনপি সন্ত্রাসীদের লক্ষ্য বস্তু। এদের তান্ডবে অনেকেই গ্রামের বাড়ী ছেড়ে উপজেলা সদরে আশ্রয় নিয়েছিল আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতজনদের বাসায়। এলাকায় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও পত্রিকা মারফত জানা যায় নির্বাচন শেষ হওয়ার পরপরই গলাচিপায় বিএনপি নামধারীদের নেতৃত্বে

বিভিন্ন বাহিনী গড়ে উঠে। গোলখালী ইউনিয়নে গড়ে উঠে মহিউদ্দিন বাহিনী। হরিদেব বাজারের মাধব ডাক্তারের কাছে এ বাহিনী ১০ হাজার টাকা দাবী করায় মাধব ডাক্তার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে উপজেলা সদরে ছিল। নির্বাচনের ৬/৭ দিন পর সন্ত্রাসী মহিউদ্দিন মুদি ব্যবসায়ী হরেন শীলকে মারধর করে। এই ইউনিয়নের প্রবীণ শিক্ষক ভবেশ রায়কে ৯ অক্টোবর/২০০১ রাতে তার বাড়ীর সামনে রাস্তায় মুখে গামছা গুঁজে বেধড়ক মারপিট করে ও ''মালাউনের বাচ্চা'' বলে গালি দেয়। এছাড়াও অনেক সংখ্যালঘুকে এই বাহিনী নির্যাতন করে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে। ঘটনার এই নায়ক মহিউদ্দিনকে অবশ্য তৎকালীন পুলিশ সুপার মাঈনুর রহমান এর নির্দেশে গ্রেফতার করা হয়েছিল কিন্তু ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপে কয়েকদিন পরই সে জামিনে মুক্তি পায়। গলাচিপা কলেজের তৎকালীন সহকারী অধ্যাপক সন্তোষ কুমারের বাড়ীতে বিএনপি ক্যাডাররা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। আওয়ামীলীগের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা টিটো, যুগ্ম সম্পাদক সালাউদ্দিন আহমেদ, ইউ, পি চেয়ারম্যান গাজী মোঃ ইউসুফ, মুক্তিযোদ্ধা নুর ইসলাম মেকার, আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল হালিমের বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট হয়। এই সুযোগে সর্বহারা পাটির নাম দিয়েও চাদা দাবীর ঘটনা ঘটে। এ আসনটিতে আওয়ামীলীগ বিজয়ী হলেও সংসদ সদস্য সাহেব নির্বাচনের পরপরই ঢাকায় থাকায় নেতাকর্মীদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় তিনি তেমন কোন ভূমিকা রাখেননি বলে খোদ আওয়ামীলীগের তৃণমূল নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন।

সন্ত্রাসের জনপদ রাউজানের গহিরা গ্রামে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর তান্ডব লীলা

ঘটনাস্থলঃ চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলা

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। তিনি সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হওয়ার পর নিজ গ্রাম গহিরায় আসেন। গ্রামে আসার পরপরই তার সন্ত্রাসী ক্যাডার ফজল হক, আবু তাহের ও বিধান বড়ুয়াকে হুকুম দেন নির্বাচনে তার বিপক্ষে প্রচারে অংশ নেওয়া মহিলা মেম্বার রত্না ঘোষের বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়ার জন্য। সন্ত্রাসীরা সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় গিয়ে মহিলা মেম্বারের বাড়ীতে আগুন দিলে পার্শ্ববর্তী আরও তিনটি বাড়ীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। রত্না ঘোষের বাড়ীর সাথে চন্দন ঘোষ, সনজিত ঘোষ ও অজিত ঘোষের বাড়ীগুলো আগুনে ভস্মীভূত হয়। এভাবে চৌধুরীর ক্যাডাররা ৩৭ (সাইত্রিশ) টি স্থাপনা ধ্বংস করেছে। নির্বাচনে বিপক্ষে কাজ করার অপরাধে শতকাতুল ইসলামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন ফার্নিচার সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর হুমকির মুখে বন্ধ করে দেয়া হয়।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর দম্ভোক্তি ''অশুভ শক্তি মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কোন সহিংসতা হয় নাই। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর ভিত্তিহীন''। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন আগৈলঝড়ার নির্যাতিতা কমলা রাণী ওরফে কালা বউ।

দেশ জুড়ে ভয়ংকর রূপে চলছে নির্বাচনোত্তর সহিংসতা। খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, সম্পদ লুট, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি-জামায়াত স্বশস্ত্র ক্যাডার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী নির্দ্বিধায় অস্বীকার করছেন এসকল ঘটনা। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর ও জনমতের চাপে সরকারী কর্মকর্তা ও দলীয় কর্মীদের সাথে নিয়ে হেলিকপ্টারযোগে সরকারী সফরে বরিশালের আগৈলঝড়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আগমন। **''সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর কোন নির্যাতন না হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকায় মিথ্যা প্রতিবেদন ছাপিয়ে হেয় করা হচ্ছে সরকারকে''** স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব জহির উদ্দিন আহম্মেদ স্বপনের এই উক্তির সাথে সাথে মঞ্চে উপস্থিত আলতাফ হোসেন চৌধুরীর সামনে হাজির হন রাজিহার ইউপি সদস্য কমলা রাণী ওরফে কালা বউ। কমলা রানী মঞ্চে উঠে উপস্থিত জনতার সামনে শাড়ি খুলে তার উপর বিএনপি সন্ত্রাসীদের নির্যাতনের বর্ণনা দেন। পিণপতন স্তব্ধতা ভেঙ্গে উপস্থিত জনতা ধিক্কার ধ্বনি দিয়ে মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করে। উল্লেখ্য যে, কমলা রাণী স্থানীয় আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পক্ষে পোলিং এজেন্ট ছিল তার বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ভশ্মীভূত করে দেওয়া হয়।

সহিংসতার ঘটনা মিথ্যা প্রমাণের জন্য কমলা রাণীকে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে জনসভায় উপস্থিত করেছিল। কিন্তু সে ভয়ভীতি ও প্রলোভনের কাছে মাথানত করেনি।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বিকৃত উল্লাস। আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট হওয়ার অপরাধে নগ্ন করে বাজারে ঘোরানো হলো দুই ছাত্রলীগ কর্মীকে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী। প্রথম পটুয়াখালী আগমন ও সার্কিট হাউসে অবস্থান। পকেট থেকে বের করলেন দুইটি নাম ''মনির ও বাসার''। উভয়ই স্থানীয় ছাত্রলীগের কর্মী। তার হুকুমে ঐ দুইজনকে আটক করে মির্জাগঞ্জ উপজেলার নিউমার্কেট এলাকায় গাছের সাথে বেঁধে উভয়কে বিএনপি ছাত্রদলের ক্যাডাররা উলঙ্গ করে বেদম প্রহার করে। পরে বাজারের প্রধান প্রধান সড়কে ঘোরানোর পর একদিন গাছের সাথে বেঁধে রেখে পরের দিন উলঙ্গ অবস্থায় পুকুরে ফেলে দেয়। তাদের অপরাধ তারা ছাত্রলীগ কর্মী এবং স্থানীয় আওয়ামীলীগ প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট ছিল।

স্থানীয় বিএনপি নেতা হাফিজ ইব্রাহিমের পৈশাচিকতা । আওয়ামীলীগ কর্মী নকিবকে গুলি করে হত্যা ঘটনাস্থল ঃ বোরহান উদ্দিন উপজেলার কুতুবা গ্রামে।

০১/১০/২০০১ তারিখে স্থানীয় আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলছিল। বিকালের দিকে বিএনপির স্বশস্ত্র ক্যাডাররা হাফিজ ইব্রাহিমকে খবর দেয় আওয়ামীলীগ কর্মীদের বাধায় বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে জাল ভোট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মী নকিব এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় হাফপ্যান্ট বাহিনী খ্যাত হাফিজ ইব্রাহিমের স্বশস্ত্র ক্যাডাররা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ পরে হাফিজ ইব্রাহিম ঘটনাস্থলে এসে নকিবকে গুলি করার হুকুম দেয়। সাথে সাথে ক্যাডারদের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় স্থানীয় আওয়ামীলীগ কর্মী নকিবের দেহ। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে। মামলা হলেও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

আওয়ামীলীগ কর্মী খোরসেদ আলমকে নিজ হাতে গুলি করলেন মেজর (অবঃ) হাফিজ
ঘটনাস্থল ঃ ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার কালমা ইউনিয়নের চরছকিনা গ্রাম।

গত ০১/১০/২০০১ তারিখে ভোট গ্রহণের শেষে গণনাকালে স্থানীয় আলম বাজারে আজহার উদ্দিন ফ্রি প্রাইমারী স্কুল ভোট কেন্দ্রের ব্যালট ভর্তি বাক্স ছিনতাই করতে উদ্যত হয় বিএনপি ক্যাডাররা। স্থানীয় জনসাধারণ কেন্দ্র ঘেরাও করে রাখে। মেজর (অবঃ) হাফিজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভোট কেন্দ্রে জোরপূর্বক ঢোকার চেষ্টা করে। স্থানীয় জনগণের বাধায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষিপ্ত হাফিজ নিজের হাতে থাকা পিস্তল দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। স্থানীয় দুই আওয়ামীলীগ কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মারা যায় আওয়ামীলীগ কর্মী খোরসেদ আলম। মেজর হাফিজ প্রভাবে সে মামলা থেকে অব্যাহতি পায়।

পাশবিক নির্যাতনে অসহায় বাবার আর্তনাদ
ঘটনাস্থল ঃ বরিশালের বানারীপাড়া

বানারীপাড়া উপজেলার মাদারকাঠি, ব্রাহ্মণকাঠি, আলতা, নরেরকাঠি, বিশারকান্দি, বাইশারি, দত্তপাড়া, কালিবাড়ী, ব্রাহ্মণবাড়ী, কালিরবাজার গ্রামগুলো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল থেকে সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে এই গ্রামগুলো।

৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বিএনপি দলের পক্ষে সর্বহারা দলীয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজরা এসব এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এসব সন্ত্রাসীদের হাতে কিশোরী, তরুনী থেকে শুরু করে বয়স্ক মহিলারাও গণধর্ষণের শিকার হয়। অস্ত্রের মুখে বাবাকে জিম্মি করে ১০/১২ জন সন্ত্রাসী তার কিশোরী মেয়েকে যখন ধর্ষণ করছিল তখন অসহায় ঐ বাবা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, বাবারা তোমরা একসঙ্গে যেওনা মেয়েটি আমার ছোট, মরে যাবে। এই অসহায় বাবার বুক ফাটা আর্তনাদ শুনেনি ঐ সন্ত্রাসীরা। ঐ ধর্ষিতা কিশোরী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জালড়ে বেঁচে আছে।

বিঃ দ্রঃ-পরিবারের অনুরোধে নাম প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা হলো। সরেজমিন পরিদর্শন কালে ঘটনাটি স্থানীয় জনগণ কমিশনকে অবহিত করে।

আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যাকান্ড

গত ০৭-০৫-২০০৪ তারিখ দুপুর ১২.৩০ ঘটিকার সময় গাজীপুর জেলাধীন টঙ্গী রেল স্টেশনের পিছনে নয়াগাঁও এমএ মজিদ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্থানীয় ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় মাননীয় সাংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার । সম্মেলন সকাল ১০টায় যথারীতি শুরু হয়। ঐ স্কুলের পাশেই এক ভাড়া বাসায় থাকতেন সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টার। আহসান উল্লাহ মাস্টার লুঙ্গি পরে সকাল বেলা বাসা থেকে বের হয়ে পায়ে হেটে কয়েকজন দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সরাসরি সম্মেলন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এখানে নির্বিঘ্নেই অনুষ্ঠান চলছিল। এ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে সাংসদ কমিটি ঘোষণা করেন। ঘোষণার পর তিনি কয়েকজনের সঙ্গে স্কুল মাঠে সম্মেলনের জন্য সাজানো প্যান্ডেল থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে প্যান্ডেলের পিছন দিক থেকে ৭/৮ জন সশস্ত্র যুবক এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে স্কুল বাউন্ডারির ভিতরে ঢোকে। এ সময়ে গুলির শব্দে সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ে। সাংসদ আহসান উল্লাহ মাস্টারসহ সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে সবাই হতচকিত হয়ে পড়েন। সন্ত্রাসীরা এক পর্যায়ে সাংসদের সামনে এসে তাকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। কোন কোন সন্ত্রাসীর দুই হাতে অস্ত্র দেখা গেছে। এ অবস্থায় সাংসদকে যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান মহাল জড়িয়ে ধরে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা দুজনকেই গুলি করে সামনের গেট দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে যায়। যাবার সময় তারা এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে জনাব আহসান উল্লাহ মাস্টারের নির্মাণাধীন বাসার পাশ দিয়ে চলে যায়। এ এলোপাতাড়ি গুলিতে স্কুল ছাত্র রতন (১০), বাবুলসহ (১২) ৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এদিকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর পরই পুরো এলাকার দৃশ্য পাল্টে যায়। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টারকে সেখান থেকে সরাসরি টঙ্গী হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক না থাকায় বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নেয়া হয়। এখানে ডাক্তার না থাকায় সেখানে চিকিৎসাহীন অবস্থায় তাকে প্রায় ১ ঘন্টা ফেলে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেয়া হলে এখানে ৩.১০ মিনিটে কর্তব্যরত ডাক্তার সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এছাড়া গুলিবিদ্ধ যুবলীগ নেতা মহাল, স্কুল ছাত্র বাবুল, রতন, শরীফ উদ্দিন, জামাল উদ্দিন, হাসেম মল্লিককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার রতনকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ সংক্রান্তে সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকান্ডের ঘটনায় ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ আরো ১০/১২ জন অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীকে আসামী করে টঙ্গী (গাজীপুর) থানার মামলা নং-৭, তারিখ ০৮/০৫/২০০৪ ধারা ১২০-খ/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১০৯/২১২ দঃ বিঃ একটি নিয়মিত মামলা রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে সিআইডি পুলিশ আদালতে ৩০ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্রুনাল ঢাকা বিচারান্তে বিজ্ঞ বিচারক গত ১৬/০৪/২০০৫ ইং তারিখ ৩০জন অভিযুক্তের মধ্যে ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ০৬ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তৎসহ ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরো ০১ বৎসর করে কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত অপর ০২জনকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের নাম (১) নুরুল ইসলাম সরকার, (২) নুরুল ইসলাম দিপু, (৩) মোহাম্মদ আলী, (৪) মাহাবুব, (৫) আমির, (৬) মজনু, (৭) শহিদুল ইসলাম দিপু, (৮) কানা হাফিজ, (৯) আনোয়ার হোসেন আনু, (১০) ফয়সাল, (১১) সোহাগ @ সরু, (১২) ময়মনসিংহের জাহাঙ্গীর, (১৩) লোকমান @ বুলু, (১৪) আল-আমিন, (১৫) রতন মিয়া @ বড় রতন, (১৬) রনি @ রনি ফকির, (১৭) জাহাঙ্গীর, (১৮) রতর @ ছোট রতন, (১৯) আবু সালাম, (২০) দুলাল, (২১) খোকন, (২২) মশিউর রহমান @ মশু এবং যাবতজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের নাম (১) রাকিব উদ্দিন সরকার @ পাপ্পু, (২) আইউব আলী, (৩) জাহাঙ্গীর, (৪) নুরুল আমিন @ আমিন, (৫) মনির, (৬) ওহিদুল ইসলাম @ টিপু।

নির্মমভাবে হত্যা করা হলো সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে

গত ২৭/০১/২০০৫ ইং তারিখ বিকাল ১৬.০০ ঘটিকার সময় হবিগঞ্জ জেলাধীন হবিগঞ্জ সদর থানার ১০নং লস্করপুর ইউনিয়ন এর অর্ন্তগত বৈদ্যের বাজার সরকারী প্রাইমারী স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে স্থানীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব শাহ এএমএস কিবরিয়া। সভা শেষে জনাব কিবরিয়া ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাকর্মীরা চলে যাওয়ার সময় সন্ধ্যা অনুমান ১৯.১০ ঘটিকার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের গেটের সামনে আশামাত্র কাকতালীয়ভাবে বিদ্যুৎ চলে যায়। ঐ সুযোগে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী'দের হত্যার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে উক্ত জঙ্গী সংগঠনের সদস্যরা জনাব কিবরিয়াকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়ে মারে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ছোড়া গ্রেনেডটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলেই (১) শাহ মঞ্জুর হুদা, (২) মোঃ সিদ্দিক আলী @ ছায়ের আলী, (৩) আব্দুর রহিম নিহত হয় এবং পরবর্তীতে (৪) জনাব শাহ এ এম এস কিবরিয়া, (৫) আবুল হোসেন মারা যান।

এ ঘটনায় হবিগঞ্জ থানার মামলা নং- ২৭, তারিখ ২৮/১/০৫ ধারা ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২ দঃ বিঃ ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে আসামী ১। মুফতি হান্নান, ২। শরীফ শাহেদুল আলম @বিপুল, ৩। মুন্সী মহিবুল্লাহ @ মফিজ উদ্দিন @ অভি, ৪। নাইমুর রহমান @ হাফেজ সৈয়দ নাইম আহমেদ আরিফ @ নিমু (৫) মঈন উদ্দিন সেখ @ মুফতি মঈন @ খাজা @ আবু জান্দাল @ মাসুম বিল্লাহ (৬) বদরুল আলম মিজান, (৭) আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ তাজউদ্দিন, (৮) মিজানুর রহমান @ মিজানদের বিরুদ্ধে তদন্তে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া গেছে। বর্ণিত আসামীরা ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলে আদালতে তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বিচারিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাছাড়া তদন্তে মামলার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে এবং প্রকৃত আসামীদের সনাক্ত ও ধৃত করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জোট সরকারের সময়ে তদন্ত সঠিকভাবে পরিচালিত হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের হত্যা করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই হরকাতুল জিহাদের নেতাকর্মী'দের মাধ্যমে একটি অশুভচক্র এই প্রবীণ জনপ্রিয় নেতাকে হত্যা করে। তদন্ত শেষ হলে প্রকৃত অপরাধীদের মুখোশ উন্মোচিত হবে।

প্রাক্তন মহিলা এমপি জেবুনন্নেছা হক এর বাসায় গ্রেনেড হামলা

গত ২৪/১২/২০০৪ ইং তারিখ আনুমানিক ১৬.১৫ ঘটিকার সময় মাননীয় প্রাক্তন মহিলা সংসদ সদস্য জেবুন্নেছা হকের তাতী পাড়াস্থ বাসা যার নং- ২২(ক) তাতপাড়া, থানা-কোতয়ালী, সিলেট নিজ বাসায় অবস্থানকালে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী'দের হত্যা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রাক্তন মহিলা এমপি জেবুন্নেছা হক এর বাসায় হরকাতুল জিহাদের সদস্যরা গ্রেনেড হামলা চালায়। জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদের সদস্যদের গ্রেনেড হামলায় বর্ণিত সংসদ সদস্যসহ ০৮ (আট) জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী মারাত্মক আহত হয়। এ সংক্রান্তে কোতয়ালী (সিলেট) থানার মামলা নং- ৭৪, তারিখ ২৪/১২/২০০৪ ধারা বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩ রুজু হয়। মামলাটি তদন্তকালে আসামী হিসাবে (১) মুফতি হান্নান, (২) মফিদুল ইসলাম @ অভি , (৩) শরীফ শাহেদুল আলম বিপুল, (৪) মোঃ দেলোয়ার হোসেন রিপন, (৫) মুফতি মহিউদ্দিন শেখ @আবু জান্দাল @ খাজা @ মাসুম বিল্লাহ (৬) হুমায়ুন কবির @ হিমু (পলাতক) দের বিরুদ্ধে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্ণিত আসামীরা ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি বিচারিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। মামলাটি অভিযোগপত্র দাখিলের অপেক্ষায় মূলতবী আছে।

সংসদ সদস্য জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের উপর বোমা হামলা

গত ২১/০৬/২০০৪ ইং তারিখ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত দলীয় নেতাকর্মীসহ সুনামগঞ্জ জেলাস্থ দিরাই থানা এলাকায় জনসভা শেষ করে দিরাই বাজারস্থ জগন্নাথ জিউর মন্দির সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে রাস্তায় বিকাল আনুমানিক ১৬.৫৫ ঘটিকার সময় পৌছালে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জনাব সুরঞ্জিত সেন গুপ্তকে লক্ষ্য করে ০২টি গ্রেনেড ছুড়ে মারে। জঙ্গীদের ছোড়া ০২টি গ্রেনেডের মধ্যে ০১টি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলেই ০১জন কর্মী নিহত এবং ৩০/৩২ জন মারাত্মক আহত হয়। মাননীয় সংসদ সদস্য সামান্যের জন্য এ হামলা হতে রক্ষা পান।

এ সংক্রান্তে দিরাই (সুনামগঞ্জ) থানার মামলা নং-৬, তারিখ- ২২/০৬/২০০৪ ধারা ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদির আইনের ৩ ধারায় মামলা রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে আসামী (১) হাফেজ মাওলানা মুফতি আব্দুল হান্নান মুন্সী, (২) মোঃ শরীফ শাহেদুল আলম বিপুল, (৩) মুফতি মঈনুদ্দিন সেখ, (৪) মোঃ মফিজুল ইসলাম, (৫) মোঃ দেলোয়ার হোসেন, (৬) হাফিজ সৈয়দ নঈম আহমেদ আরিফ ও (৮) নাজিউর রহমান

গংদের বিরুদ্ধে দিরাই থানার (সুনামগঞ্জ) অভিযোগ পত্র নং- ৯৯, তারিখ ১৪/১২/২০০৮ ধারা ১২০ (খ) /৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪/১০৯/১১৪/৪২৭ দঃ বিঃ এবং অভিযোগ পত্র নং- ১০০, তারিখ ১৪/১২/২০০৮ ধারা বিঃ দ্রঃ আইন ৩/৪/৫/০৬ দাখিল করা হয়।

মামলাটি তদন্তকালে গ্রেফতারকৃত আসামী হরকাতুল জিহাদের সদস্য হাফেজ সৈয়দ নঈম আহমেদ আরিফ @ নিমুর জবানবন্দীতে প্রকাশ পায় যে ঐ ঘটনায় ০২টি গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ০১টি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়েছিল, অপর গ্রেনেডটি সম্পর্কে অভিযোগপত্রে কোন মন্তব্য না থাকায় মামলাটি অধিকতর তদন্তের জন্য বিজ্ঞ আদালতে আদেশ হয়। আদেশের প্রেক্ষিতে মামলাটি বর্তমানে সিআইডি তদন্ত করছে। আওয়ামী লীগের প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের হত্যার যে পরিকল্পনা একটি অশুভচক্র গ্রহণ করেছিল এ বোমা হামলা তারই অংশ।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব বদরুদ্দিন আহমেদ কামরানকে হত্যার চেষ্টা

গত ০৭/০৮/২০০৪ ইং তারিখ ১৯.৫৫ ঘটিকার সময় সিলেট জেলার গুলশান হোটেলের সম্মুখে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বদরুদ্দিন কামরানকে হত্যার উদ্দেশ্যে গাড়ী পার্কিং স্থানে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একটি গাড়ীতে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটাইলে সিলেট জেলার আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মোঃ ইব্রাহিম, এ্যাডঃ মেজবা উদ্দিন সিরাজসহ ৩৫ জন মারাত্মক আহত হয়। তার মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মোঃ ইব্রাহিম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এ সংক্রান্তে কোতয়ালী (সিলেট) থানার মামলা নং-৩৬, তারিখ ০৮/০৮/২০০৪ ধারা ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৪২৭/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩ ধারা রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে ০৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

গত ০২/১২/২০০৫ ইং তারিখ ১৯৩০ ঘটিকার সময় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান মহোদয়ের টিলাগড় ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত সাজ্জাদুর রহমান স্মৃতি ব্যাট মিন্টন প্রতিযোগিতা/২০০৫ টিলাগড় জামে মসজিদের দক্ষিণে সিলেট তামাবিল সড়কের পার্শে আব্দুল হানিফ কুটুর কলোনীর পূর্ব পার্শে ছোঠ খালী জায়গায় ব্যাট মিন্টন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে মাঠের পার্শে ছোট স্টেজে অবস্থান করে মেয়র মহোদয় বক্তব্য প্রদান কালে রাত অনুমান ২০.২০ ঘটিকার সময় **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ব্যাট মিন্টন মাঠের মধ্যে একটি গ্রেনেড ছুড়ে মারে কিন্তু গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত

হয়ে গ্রেনেডটি হেফাজতে নেয়। পরবর্তীতে পুলিশ বাদী হয়ে থানায় এজাহার দিলে কোতয়ালী (সিলেট) থানার মামলা নং- ৭, তারিখ ০৩/১২/২০০৫ ইং ধারা ১২০-খ/৩০৭/৩০৯/১১৪/৩৪ পিসি একটি নিয়মিত মামলা রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে আসামী (১) দেলোয়ার হোসেন রিপন, (২) মুফতি আব্দুল হান্নান মুন্সী, (৩) মোঃ মফিজুল ইসলাম, (৪) মুফতি মঈনুদ্দিন, (৫) হুমায়ুন কবির হিমু, (৬) শরীফ শাহেদুল আলম বিপুলদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল হয়।

গ্রেনেড হামলার শিকার ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী

সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রেহাই পেলেন না বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্ত রাজ্যের মান্যবর হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী। তিনি গত ২১/০৫/২০০৪ ইং তারিখ সিলেট হযরত শাহজালাল রহমত (রহঃ) এর মাজার জিয়ারত করতে গেলে সেখানে জুম্মার নামাজ শেষ করে মুসল্লিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় কালে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** মাননীয় ব্রিটিশ হাই কমিশনার মহোদয়কে হত্যার উদ্দেশ্যে উক্ত জঙ্গী সংগঠন একটি শক্তিশালী গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। জঙ্গী সংগঠনের গ্রেনেড হামলায় বিট্রিশ হাইকমিশনার ও তৎকালীন জেলা প্রশাসক (সিলেট) মারাত্মকভাবে আহত হন। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এএসআই মোঃ কামাল হোসেন উক্ত গ্রেনেড হামলায় নিহত হন। এ ঘটনায় সিলেট কোতয়ালী থানার এসআই প্রদীপ কুমার দাস বাদী হয়ে কোতয়ালী (সিলেট) থানায় মামলা নং- ৬৪, তারিখ ২১/০৫/২০০৪ ধারা ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ পিসি রুজু করে। মামলাটি তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা এএসপি মুন্সী আতিকুর রহমান আসামী (১) মোঃ দেলোয়ার হোসেন রিপন, (২) শরীফ শাহেদুল আলম বিপুল, (৩) মুফতি আব্দুল হান্নান মুন্সী @ আবুল কালাম, (৪) মহিবুল্লাহ @ মফিজুর রহমান @ মফিজ @ অভি, (৫) মুফতি মঈন @ আবু জান্দাল @ খাজা @ মাসুম বিল্লাহ, (৬) মৃত আহসান উল্লাহ কাজলদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, ৬নং আসামী মৃত হওয়ায় তাকে চার্জসীট হতে বাদ দিয়ে কোতয়ালী (সিলেট) থানার অভিযোগপত্র নং- ৬০০, তারিখ ০৭/০৬/২০০৭ ধারা ১২০-খ/৩২৬/৩০২/৩৪/১০৯/১১৪/১১১ পিসি, অভিযোগপত্র নং-৬০১, তারিখ ০৭/০৬/২০০৭ ধারা বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ৩/৪/৫/৬ দাখিল করেন। পরবর্তীতে অধিকতর তদন্তে সম্পূরক অভিযোগপত্র নং- ১৮৪, তারিখ ১১/০৩/২০০৮ এবং অভিযোগপত্র নং- ১৮৫ ধারা ৩/৪/৫/৬ দাখিল করেন।

মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল সিলেট বিচার শেষে গত ২৩/১২/২০০৮ ইং তারিখে ঘোষিত রায়ে ট্রাইব্যুনাল আসামী (১) মুফতি আব্দুল হান্নান মুন্সী @ আবুল কালাম, (২) মহিবুল্লাহ @ মফিজুর রহমান @ মফিজ @ অভি, (৩) মুফতি মঈন @ আবু জান্দাল @ খাজা @ মাসুম বিল্লাহ (৪) মোঃ দেলোয়ার হোসেন রিপন, (৫) শরীফ শাহেদুল আলম বিপুলদের প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন।

১৭ আগষ্ট/০৫ সারাদেশে জেএমবি কর্তৃক একযোগে জঙ্গী বোমা হামলা

বিগত বিএনপি -জামাত জোট সরকারের আমলে ১৭ আগষ্ট/০৫ তারিখে সারাদেশে জঙ্গী সংগঠন জামায়েতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) একযোগে বোমা হামলা চালায়। কেবলমাত্র মুন্সীগঞ্জ জেলা ব্যতীত দেশের ৬৩টি জেলার এক বা একাধিক স্থানে এই বোমা হামলা পরিচালিত হয়। এ বোমা হামলায় কেহ নিহত না হলেও সারাদেশের মানুষ স্তম্ভিত ও আতংকিত হইয়া পড়ে। আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জঙ্গী সংগঠন জেএমবি এ বোমা হামলার মাধ্যমে তাদের সাংগঠনিক সামর্থ ও সারাদেশে তাদের অবস্থান সম্পর্কে জানান দেয়। ঘটনার পরপরই সরকার এই নৃশংস হামলার দায়দায়িত্ব বিরোধী দলের উপর চাপানোর প্রয়াস নেয় পরবর্তী পর্যায়ে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংগঠন সর্বোপরি আর্ন্তজাতিক চাপের কারণে ঘটনার রহস্য উদঘাটনে সরকার বাধ্য হন। পুলিশ ও র‍্যাবের সদস্যগণ জেএমবির পরিচয় ও তাদের নেতাকর্মীদের পরিচয় উদঘাটনে মাঠে নামে। একপর্যায়ে বোমা হামলাকারীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়তে থাকলে জিজ্ঞাসাবাদে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হতে থাকে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জানতে পারেন এই জঙ্গী সংগঠনের মূল নেতা শায়খ আব্দুর রহমান এবং সিদ্দিকুর রহমান @ বাংলা ভাই। কে এই বাংলা ভাই ? ২০০১ সনে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোর জেলার স্থানীয় বিএনপি নেতাদের ছত্রছায়ায় এ বাংলা ভাই তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করে সর্বহারা দমনের নামে তাহার অনুসারীদের নিয়ে আইন বহির্ভূত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় কিছু সর্বহারা নেতা কর্মীদের আটক ও হত্যা করিয়া এলাকার সাধারণ মানুষের সমর্থন ও আস্থা অর্জন করে। পরবর্তীতে দেশের প্রচলিত আইনকে অবজ্ঞা করে একের পর এক মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে। বাংলা ভাই এর নেতৃত্বে জেএমবি'র সদস্যরা নিজেরাই এলাকার শালিস বিচারের মাধ্যমে মানুষ হত্যা ও চাঁদা আদায়ে লিপ্ত হয়। কথিত আছে নওগাঁর সাবেক প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির, রাজশাহীর সাবেক মন্ত্রী ব্যারিষ্টার আমিনুল হক, সাবেক এমপি নাদিম মোস্তফা, নাটোর সাবেক উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই জঙ্গী সংগঠনকে সহযোগিতা করতে থাকে। জোট সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী এমপিরা সরাসরি জড়িত থাকার কারণে স্থানীয় প্রশাসন এদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হতে বিরত থাকে। এলাকায় যখন ত্রাসের রাজত্ব বিরাজমান

তখন বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং রাজনৈতিক সংগঠন জেএমবির নৃশংসতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যজনক বিষয় হলো সরকারের দায়িত্বশীল মহল একে অস্বীকার করতে থাকে। এমনকি বাংলা ভাইয়ের কোন অস্তিত্ব নেই- বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি বলে সরকার প্রচার করেন। সরকারের এ ধরনের প্রকাশ্য সমর্থন পেয়ে জেএমবি আরো বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং ভিতরে ভিতরে নিজেদের আসল উদ্দেশ্যে সাধনের লক্ষ্যে সারাদেশে তাদের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে। দীর্ঘ ০৩ (তিন) বছরের কর্মতৎপরতার পর ১৭ আগষ্ট/০৫ সালে তাহাদের উপস্থিতি ও সাংগঠনিক শক্তি প্রকাশ করে। ১৭ আগষ্ট/০৫ সারাদেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পর বিভিন্ন থানায় ১৫৬ টি মামলা রুজু হয়। মামলার তদন্তকালে একে একে আসামী ধরা পড়তে থাকলে এবং দলীয় নেতাদের নাম প্রকাশিত হতে থাকলে জেএমবি আরো বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঝালকাঠি, গাজীপুরসহ আরো কয়েকটি স্থানে আত্মঘাতি বোমা হামলা চালায়। এসব হামলায় বিচারক, আইনজীবী, পুলিশসহ বহু নিরীহ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। এমনই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেশীয় এবং আর্ন্তজাতিক চাপের কারণে সরকার জেএমবি নির্মূলে বাধ্য হয়। ফলশ্রুতিতে একে একে দলীয় প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাইসহ মোঃ আতাউর রহমান @ তারেক সানি ইবনে আব্দুল্লাহ, আব্দুল আউয়াল @ আরাফাত @ সামাদ, ইফতেখার হাসান @ মামুন, আমজাদ @ খালেদ সাইফুল্লাহ @ ফারুক, হাফেজ মোঃ মিনহাজুল ইসলাম @ সোহেল রানা @ সরোয়ার হোসেন, সালাউদ্দিন @ সালেহীন @ সাজিদ, @ তৌহিদ শুরা সদস্য, জহুরুল হক @ আজিজুল হক, নুরুল ইসলাম @ সাহীন @ তাপস অমর, মোঃ সফিকুল ইসলাম, আবু বক্কর সিদ্দিকসহ আরো অনেকে আটক হয়। পুলিশ বিভিন্ন হামলা তদন্ত শেষে চার্জসিট দাখিল করিতে থাকে, বিচারে এই পর্যন্ত ২২৩ জনের সাজা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৪ জনের মৃত্যুদণ্ড, ১১৪ জনের যাবতজ্জীবন কারাদণ্ড, ৮৫ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড হইয়াছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে ১/১১ এর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ১। মাওলানা আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ @ এহসান @ শায়খ আব্দুর রহমান, ২। মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম প্রামানিক @ আজিজুল ইসলাম @ অমর @লিটু @ বাংলা ভাই, ৩। মোঃ আতাউর রহমান @ তারেক সানি ইবনে আব্দুল্লাহ, ৪। আব্দুল আউয়াল @ আরাফাত @ সামাদ, ৫। ইফতেখার হাসান @ মামুন, ৬। আমজাদ @ খালেদ সাইফুল্লাহ @ ফারুক এবং আসাদুল ইসলাম @ আরিফ খানদের গত ২৯/০৩/২০০৭ ইং তারিখে ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে ২৫টি মামলা তদন্তাধীন এবং ৬৬টি মামলা বিচারাধীন আছে। জেএমবি প্রধানসহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে জেএমবি'র উত্থান ও পৃষ্ঠপোষকতাকারীদের মুখোশ দেশবাসীদের নিকট উন্মোচিত করা হয়নি এবং তাহাদিগকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়নি। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার পূর্বে শায়খ আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকদের কাছে এ ব্যাপারে বক্তব্য প্রদান করার ইচ্ছা প্রদান করেছিল। তাহাদের কথাবলার সুযোগ দিলে হয়তো তৎকালীন সরকারের অনেক প্রভাবশালী মন্ত্রী, এমপি ও নেতার মুখোশ উন্মোচিত হতো। আপাত দৃষ্টিতে সিরিজ বোমা হামলা ও জেএমবি কর্তৃক তৎপরবর্তী বোমা হামলার বিচার হলেও অনেক উপাখ্যান দেশবাসীর অজানাই রয়ে গেল।

আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম (আওয়ামীলীগ নেতা) হত্যা

গত ২৫/০৮/২০০৩ ইং তারিখ অনুমান ১০.১০ ঘটিকার সময় খুলনা মহানগরীর খুলনা থানাধীন শামসুর রহমান রোডস্থ ছোট মির্জাপুর ইমাম হোসেন চৌধুরী ময়না, ২৩ নং ওয়ার্ড কমিশনার এর বাসার পশ্চিম পার্শ্বে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট দলের সদস্যরা''** মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম ও তার সঙ্গী এ্যাডভোকেট বিজন বিহারী রিক্সাযোগে কোর্টে যাবার সময় কতিপয় সন্ত্রাসী তাদের লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গুলি বর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরন ঘটিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমামের বুকে ০২টি গুলি বিদ্ধ হয় এবং সঙ্গীয় এ্যাডভোকেট বিজন বিহারীও গুলিবিদ্ধ হয়। সন্ত্রাসীদের বোমার আঘাতে রিক্সা চালক সাইদুল আকন্দের একটি পা শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ এ্যাডঃ মঞ্জুরুল ইমামকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় গরীবে নেওয়াজ ক্লিনিকে নেয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন। এ সংক্রান্তে খুলনা থানার মামলা নং-২৭ তারিখ ২৫/০৮/২০০৩ ধারা ৩৪১/৩০২/৩২৬/৩০৭/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ৩/৬ ধারা রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট এমএল দলের ১। শুকুর গাজী, ২। আব্দুর রাব্বি @ রিপন, ৩। গনেশ ব্যানার্জী, ৪। ইমাম সরদার @ ইমামদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে খুলনা থানার অভিযোগ পত্র নং-৮১, তারিখ -১১/০৩/২০০৪ ধারা ৩০২/৩৪/ দঃ বিঃ দাখিল করেন। পরবর্তীতে সম্পুরক অভিযোগপত্র নং-৩৬, তারিখ ২৪/০১/২০০৮ তে বর্ণিত আসামীসহ আরো একজন আসামী সেখ সাহাদাত হোসেন @ রাজুকে অভিযুক্ত করে সম্পুরক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন আছে। আলহাজ্ব এ্যাডঃ মঞ্জুরুল ইমামের মত একজন সৎ ও জনপ্রিয় নেতাকে জোট সরকারের আমলে নৃশংসভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে ও বোমা বিস্ফোরন ঘটিয়ে হত্যা করে।

সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা ঃ

গত ১৫/০১/২০০৪ ইং তারিখ দুপুর অনুমান ১৩.২৫ ঘটিকার সময় সাংবাদিক এ্যাডভোকেট মানিক সাহা প্রেস ক্লাব হইতে পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য ৩৭নং স্যার ইকবাল রোড এবং ছোট মির্জাপুর রোডের সংলগ্ন মোড়ে পৌছাইলে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট দলের সদস্যরা''** তাকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলে বোমার আঘাতে তার মাথার অংশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। এ সংক্রান্তে খুলনা সদর থানার মামলা নং- ২৮, তারিখ ১৭/০১/২০০৪ ধারা ৩০২/৩৪ দঃ বিঃ এবং মামলা নং-২৯ তারিখ ১৫/০১/২০০৪ ধারা বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ৩/৬ রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে এরশাদ সিকদারের সহযোগী ১। সুমন @ নুরুজ্জামান, ২। বুলবুল হোসেন @ বুলু, ৩। সাত্তার @ ডিসকো সাত্তার, ৪। বেলাল, ৫। মিঠুল, ৬। সাকা @ শওকত হোসেন, এবং পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট এমএল দলের ৭। আকরাম হোসেন @ আকরাম হাওলাদার @ বোমারু আকরাম,

৮। আলী আকবার সিকদার @ শাওন, ৯। কচি @ওমর ফারুক, ১০। আলতাফ @বিডিআর আলতাফ @ বিডিআর সিদ্দিক, ১১। সরো @ সরোয়ার হোসেন, ১২। মাহফুজ @ মফিজ @ নাসির @ সফিকুল ইসলাম'দের বিরুদ্ধে খুলনা সদর থানার অভিযোগপত্র নং- ১৯২, তারিখ ২৪/০৬/২০০৪ ধারা ৩০২/৩৪ দঃ বিঃ দাখিল করেন। মামলাটি বর্তমানে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে। সাংবাদিক মানিক সাহা একজন সৎ, নির্ভীক ও সাহসী সাংবাদিক ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি তার লেখার মাধ্যমে সন্ত্রাসের কারণ ও সন্ত্রাসীদের মুখোশ উন্মোচনে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থি দলের এবং তাদের মদদ দাতাদের বিরুদ্ধে তার কলম ছিল সরব। যার কারনে সন্ত্রাসীরা তাদের গডফাদারদের ইন্ধনে এ নির্ভীক সাহসী সাংবাদিককে হত্যা করে।

সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালু হত্যা

গত ২৭/০৬/২০০৪ ইং তারিখ দুপুর অনুমান ১২.৫০ ঘটিকার সময় ইসলামপুর রোডস্থ দৈনিক জন্মভূমি পত্রিকা ভবনের গেটে **''নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ববাংলা কমিউনিষ্ট দলের সদস্যরা''** বোমা বিস্ফোরন ঘটাইয়া পত্রিকার সম্পাদক জনাব হুমায়ুক কবির বালুকে মারাত্মক জখম করে। মারাত্মক জখম অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অনুমান ১৩.৩০ ঘটিকার সময় মারা যান। এ সংক্রান্তে খুলনা সদর থানার মামলা নং-৪০, তারিখ ২৮/০৬/২০০৪ ধারা ৩০২/৩৪ দঃ বিঃ এবং মামলা নং-৪১ তারিখ ২৮/০৬/২০০৪ ধারা বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৬ রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে থানার তদন্তকারী কর্মকর্তা পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট এমএল দলের ১। এম জাহিদুর রহমান @ জাহিদ, ২। নজরুল ইসলাম নজু, @ খোড়া নজু, ৩। সাদিকুর রহমান @ রিমন, ৪। স্বাধীন @ ইকবাল, ৫। রিপন আহমেদ @ সোয়েব @ সাইদুজ্জামান, ৬। সুমন @ শরীফুজ্জামন, ৭। আব্দুর রশিদ তপন @ দাদা তপন এবং ৮। মাসুম @ জাহাঙ্গীরদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে খুলনা সদর থানার অভিযোগপত্র নং-৯৭, তারিখ ২৫/৪/২০০৪ ধারা ৩০২/৩৪ দঃ বিঃ দাখিল করা হয়। বাদীর নারাজির প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালতের আদেশে মামলা ০২টি সিআইডি পুলিশের নিকট তদন্তাধীন আছে। সাংবাদিক হুমায়ুন কবির বালু একজন সৎ, নির্ভীক ও সাহসী সাংবাদিক ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি তার লেখার মাধ্যমে সন্ত্রাসের কারণ ও সন্ত্রাসীদের মুখোশ উন্মোচনে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থি দলের এবং তাদের মদদ দাতাদের বিরুদ্ধে তার কলম ছিল সরব। যার কারনে সন্ত্রাসীরা তাদের গডফাদারদের ইন্ধনে এ নির্ভীক সাহসী সাংবাদিককে হত্যা করে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যালঘু নারী ধর্ষনের উন্মাদনায় মেতেছিল সন্ত্রাসীরা

গত ০২/১০/২০০১ ইং তারিখ হতেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যালঘু মহিলাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। কিছু কিছু গ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মহিলারা ও মানবেতর জীবন-যাপন করেছে। এরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রাতে ঘরের বাইরে যেতে পারেনি। সংখ্যালঘু ছাত্রীরা কলেজ-স্কুলমুখী হচ্ছিল না। অনেকে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অন্যের বাড়ীতে রাত যাপন করতে থাকে। মাঝরাতে নারীর করুন আত্মচিৎকারে এই অঞ্চলের গ্রামের পর গ্রাম কেঁপে উঠে। নির্বাচনের পর থেকে কমপক্ষে এই অঞ্চলের ৫০ জন মহিলা ধর্ষনের স্বীকার হয়েছে। এর মধ্যে ০২ জনকে ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়। অব্যাহত নারী নির্যাতনের ঘটনায় হাজার হাজার মহিলার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখিত নির্বাচনের পরদিন থেকেই এই অঞ্চলের সন্ত্রাসীরা তাদের কালো থাবা বাড়িয়ে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের উপর মারপিট শুরু হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঢিলেঢালা হওয়ার কারনে এর পর শুরু হয় বাড়ীঘর লুটপাট। নৌকার সমর্থকদের মধ্যে এ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আর এই সুযোগে লম্পটরা তাদের টার্গেট হিসেবে সংখ্যালঘু ছাড়াও গ্রামের আওয়ামী লীগ সমর্থক মহিলাদের বেছে নেয়। রাতের আধারে হায়নার মতো একের পর এক নারী ধর্ষনের উন্মাদনায় মেতে ওঠে। কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার গুড়ারপাড়া গ্রামের গৃহবধূ আনোয়ারা বেগমকে লম্পটরা গত ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ বাড়ী থেকে অপহরন করে নিয়ে যায়। এরপর তাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। গত ০৮/১০/২০০১ ইং তারিখ একটি আখ ক্ষেত থেকে আনোয়ারার লাশ উদ্ধার করা হয়। গত ১১/১০/২০০১ ইং তারিখ যশোরের শার্শা থানার গাতিপাড়া গ্রামের ০২ সন্তানের জননী আঞ্জুয়ারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাহিরে বের হলে লম্পটরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। ১৩/১০/২০০১ ইং তারিখ গ্রামের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এই মহিলা নৌকার সমর্থক ছিল। তাকেও ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ শহরে সিনেমা হলগুলোতে সিরিজ বোমা হামলায় নিহত ১৬ জন

১। অজন্তা সিনেমা হলে বোমা হামলা ঃ গত ০৭/১২/২০০২ ইং তারিখ অজন্তা সিনেমা হলে ''প্রিয়তুমি কোথায়'' ছবির সান্ধ্যকালীন শো-চলাকালীন অনুমান ১৭.২৫ ঘটিকার সময় **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা''** সিনেমা হলের দোতলায় বোমা হামলা চালায়। জঙ্গীদের বোমা হামলায় বিকট শব্দে বিস্ফোরন ঘটিলে ০২ জন নিহত এবং ১৩/১৪ জন মারাত্মক আহত হয়। এ সংক্রান্তে কোতয়ালী (ময়মনসিংহ) থানার মামলা নং- ১২, তারিখ ০৭/১২/২০০২ ধারা ৩ ও ৬ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন তৎসহ ধারা ১৫ (১) (ক) বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল হয়। মামলাটি বিচারাধীন আছে।

২। অলকা সিনেমা হলে বোমা হামলা ঃ গত ০৭/১২/২০০২ ইং তারিখ অলকা সিনেমা হলে ''ধ্বংস'' ছবির সান্ধ্যকালীন শো-চলাকালীন অনুমান ১৮.৪৫ ঘটিকার সময় **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা''** সিনেমা হলের দোতলায় বোমা হামলা চালায়। জঙ্গীদের বোমা হামলায় বিকট শব্দে বিস্ফোরন ঘটিলে ০১ জন মহিলা, ০১ জন শিশুসহ মোট ০৮ জন নিহত এবং ২০/২১ জন

মারাত্মক আহত হয়। বিস্ফোরনে সিনেমা হলের ২০/২২ টি সিট ভেঙ্গে পড়ে সিলিং এর অংশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সংক্রান্তে কোতয়ালী (ময়মনসিংহ) থানার মামলা নং- ১৩, তারিখ ০৭/১২/২০০২ ধারা ৩ ও ৬ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন তৎসহ ধারা ১৫ (১) (ক) বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল হয়। মামলাটি বিচারাধীন আছে।

৩। পূরবী সিনেমা হলে বোমা হামলা ঃ গত ০৭/১২/২০০২ ইং তারিখ পূরবী সিনেমা হলে ''সুন্দরী বধূ'' সান্ধ্যকালীন শো-চলাকালীন সময় অনুমান ১৭.১৫ ঘটিকার সময় **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা''** সিনেমা হলের দোতলায় বোমা হামলা চালায়। জঙ্গীদের বোমা হামলায় দোতলায় বিকট শব্দে বিস্ফোরন ঘটিলে ০৪ জন নিহত এবং ১৫/২০ জন মারাত্মক আহত হয়। এ সংক্রান্তে কোতয়ালী (ময়মনসিংহ) থানার মামলা নং- ১৪,তারিখ ০৭/১২/২০০২ ধারা ৩ও৬ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন তৎসহ ধারা ১৫ (১) (ক) বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল হয়। মামলাটি বিচারাধীন আছে।

৪। ছায়াবানী সিনেমা হলে বোমা হামলা ঃ গত ০৭/১২/২০০২ ইং তারিখ ছায়াবানী সিনেমা হলে ''প্রিয়তুমি কোথায়'' ছবির সান্ধ্যকালীন শো-চলাকালীন অনুমান ১৭.২৫ ঘটিকার সময় **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা''** সিনেমা হলের দোতলায় বোমা হামলা চালায়। জঙ্গীদের বোমা হামলায় দোতলায় বিকট শব্দে বিস্ফোরন ঘটিলে ০২ জন নিহত এবং ১৩/১৪ জন মারাত্মক আহত হয়। এ সংক্রান্তে কোতয়ালী (ময়মনসিংহ) থানার মামলা নং- ১৫,তারিখ ০৭/১২/২০০২ ধারা ৩ ও ৬ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইন তৎসহ ধারা ১৫ (১) (ক) বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ রুজু হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল হয়। মামলাটি বিচারাধীন আছে। উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহ জেলায় সিনেমা হলগুলোতে সিরিজ বোমা হামলায় সর্বমোট ১৬ জন নিহত এবং ৬০/৬৫ মারাত্মক আহত হয়।

২১ শে আগষ্ট ২০০৪ তারিখ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের জনসভায় নৃশংস গ্রেনেড হামলা

বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার জনাব আনোয়ার চৌধুরীর উপর সিলেটে গ্রেনেড হামলা, গোপালগঞ্জে আওয়ামীলীগ কর্মী তুষার হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ গত ২১ আগষ্ট ২০০৪ ঢাকার বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও র‍্যালির আয়োজন করে উক্ত সমাবেশে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আওয়ামীলীগ সভানেত্রীর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে উক্ত সমাবেশে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা ব্যাপক গ্রেনেড ও বোমা হামলা চালায়। এতে ১। বেগম আইভি রহমান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, ২। মোস্তাক আহমেদ সেন্টু (৪০), সহ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় উপ-কমিটি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ,

৩। রফিকুল ইসলাম আদা চাচা (৬৮), উপদেষ্টা, ঢাকা মহানগর আওয়ামীলীগ, ৪। সুফিয়া বেগম (৪০), সম্পাদিকা, ঢাকা মহানগর মহিলা আওয়ামীলীগ (দঃ), ৫। হাসিনা মমতাজ রীনা (৪৫), সভানেত্রী, ১৫নং ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামীলীগ, ৬। লিটন মুন্সী ওরফে লিটু, সভাপতি, ইউনিয়ন যুবলীগ, ৭। মোঃ বেলাল হোসেন, সহ-সাংগটনিক সম্পাদক, ৬৯ নং ওয়ার্ড যুবলীগ, ৮। ল্যান্স কর্পোরাল (অব.) মোঃ মাহবুব রশীদ, নেত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী, ৯। আবদুল কুদ্দুস পাটোয়ারী (৪০), স্বেচ্ছাসেবক লীগ কর্মী, ১০। আতিক সরকার (২১), যুবলীগ নেতা, ৮৪ নং ওয়ার্ড, ১১। নাসিরউদ্দিন (৪০), শ্রমিকলীগ কর্মী, হাজারীবাগ, ১২। রতন সিকদার (৪০), ১৩। মোঃ হানিফ ওরফে মুক্তিযোদ্ধা হানিফ(৫০), রিকশা শ্রমিক লীগ নেতা, ৩০নং ওয়ার্ড, ১৪। মামুন মৃধা (২১), সরকারি কবি নজরুল কলেজ ২য় বর্ষ, ১৫। আবুল কাসেম (৫০), ১৬। জাহেদ আলী(৩৫), ১৭। মোয়াজ্জেম হোসেন(২৫), ১৮। মমিন আলী (৩৫), ১৯। শামসুদ্দিন (৫৫), ২০। রেজেয়া বেগম (৪৫), ২১। ইছহাক মিয়া, নগরপুর, আওয়ামীলীগ কর্মী, ২২। আবুল কালাম আজাদ, ১৫নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের কার্যকরী পরিষদ ও সভাপতি, বালুঘাট ইউনিট যুবলীগ এবং অজ্ঞাতনামা ০২ জনসহ সর্বমোট মোট ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত হয় এবং আওয়ামীলীগ সভানেত্রীসহ প্রায় ১৩৭ জন নেতাকর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জীবনের তরে অনেকে পঙ্গু হয়ে যায়। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে মতিঝিল (ডিএমপি)থানার মামলা নং- ৯৭, তারিখ ২২/৮/২০০৪ ধারা ৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

হামলাকারীদের আড়াল ও মূল আসামীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রথম হতেই জোট সরকারের প্রভাবশালী মহলের ইন্ধনে তৎকালীন তদন্তকারী ও তদারককারী অফিসারগণ ''জজ মিয়া'' নাটকের অবতারনা করে। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সহকারী পুলিশ সুপার জনাব ফজলুল কবির'কে তদন্তভার দেয়া হয়। তার তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে, **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল্ ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** এ ঘটনার জন্য দায়ী। তিনি হরকাতুল জিহাদের শীর্ষ নেতা মুফতি হান্নান মুন্সীসহ ১৩ জন হুজি সদস্য ও তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম @ পিন্টুকে এ মামলায় গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১। মুফতি হান্নানসহ, ২। শরীফ শাহেদুল আলম @বিপুল, ৩। মুন্সী মহিবুল্লাহ @ মফিজ উদ্দিন @ অভি, ৪। মাওলানা আবু সাঈদ @ ডাঃ আবু জাফর, ৫। আবুল কালাম আজাদ @ বুলবুল, ৬। জাহাঙ্গীর আলম, ৭। রফিকুল ইসলাম @ সবুজ @ খালিদ সাইফুল্লাহ @ শামীম @ রাসেল, ৮। মোঃ আরিফ হাসান @ সুমন @ আব্দুর রাজ্জাক ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তাদের জবানবন্দীতে এই ঘটনায় সম্পৃক্ত ২৮ জনের নাম প্রকাশ পায় এবং মামলাটি প্রথম তদন্ত শেষে মুফতি হান্নানসহ মোট ২২ জন আসামীর বিরুদ্ধে ০২টি অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। উক্ত ২২ জনের মধ্যে আব্দুস সালাম @ পিন্টুর আপন ভাই মাওলানা তাজ উদ্দিনসহ ০৮ জন পলাতক। (১) মতিঝিল (ডিএমপি) থানার অভিযোগপত্র নং-৫০০, তারিখ ০৯/০৬/২০০৮ ধারা ৩২৪/৩২৬/১২০-খ/৩০৭/৩০২/১০৯/৩৪ দঃ বিঃ (২) মতিঝিল (ডিএমপি) থানার অভিযোগপত্র নং-৫০১, তারিখ ০৯/০৬/২০০৮ ধারা ১৯০৮ সালে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের (সংশোধিত ২০০২) এর ৩/৪/৬ ধারায় দাখিল করেন।

মামলাটি দ্রুত বিচার আদালতে বিচারের একপর্যায়ে গ্রেনেডের উৎস খুজে বের করার জন্য অধিকতর তদন্তের আদেশ হয়। বিজ্ঞ আদালতের আদেশের প্রেক্ষিতে জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ, বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা'কে অধিকতর তদন্তভার ন্যাস্ত করা হয়। বর্ধিত তদন্তকালে (১) আসামী মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর (সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী) (২) আসামী মোঃ আরিফুল ইসলাম @ আরিফ, (৩) আসামী আব্দুল মাজেদ ভাট @ মোঃ ইউসুফ ভাট, (৪) আসামী মাওলানা সেখ আব্দুস সালাম, (৫) আসামী লেঃ কমান্ডার (অবঃ) সাইফুল ইসলাম ডিউক (বেগম খালেদা জিয়ার ভাগ্নে) (৬) আসামী আব্দুল মালেক @ গোলাম মোহাম্মদ @ জিএম, (৭) আসামী মাওলানা আব্দুর রউফ'দের গ্রেফতার করা হয়। অধিকতর তদন্তে ধৃত আসামীদের মধ্যে (১) আসামী মাওলানা সেখ আব্দুস সালাম, (২) আসামী আব্দুল মাজেদ ভাট @ মোঃ ইউসুফ ভাট, (৩) আসামী আব্দুল মালেক @ গোলাম মোহাম্মদ @ জিএম, (৪) মুফতি মঈনুদ্দিন শেখ @ খাজা @ আবু জান্দাল @ মাসুম বিল্লাহ ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করলে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করে যা আদালতে বিচারিক ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। মামলাটি অদ্যাবধি সিআইডি'র নিকট তদন্তাধীন আছে। বর্তমান তদন্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ আওয়ামীলীগের গুরুত্বপূর্ন নেতাদের হত্যার উদ্দেশ্যে এ গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছিল বলে তথ্য প্রমান পাওয়া গেছে।

ঝালকাঠিতে নির্মমভাবে গ্রেনেড হামলায় নিহত ০২ জন সিনিয়র সহকারী জজ

গত ১৪/১১/২০০৫ ইং তারিখ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকার সময় অত্র মামলার বাদী গাড়ী চালক মোঃ সুলতান আহমেদ খান ঝালকাঠি সদর কোর্ট, বিচারকদের সদর কোর্টে নেওয়ার জন্য মাইক্রোবাস নিয়ে অফিসার্স কলোনীতে যায়। অফিসার্স কলোনীতে গিয়ে গাড়ী চালক (১) জনাব শহীদ সোহেল আহম্মেদ সিনিয়র সহকারী জজ, (২) জনাব জগন্নাথ পাড়ে সিনিয়র সহকারী জজ এবং (৩) অফিস পিয়ন আব্দুল মান্নানদের সরকারী মাইক্রোবাসে উঠায়ে বাসার সামনে তাদের রেখে অপর সিনিয়র সহকারী জজ আব্দুল আউয়াল সাহেবকে কোর্টে যাওয়ার জন্য ডাকতে গেলে পথিমধ্যে ০৮.৫৭ ঘটিকার সময় **''নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ আল্ ইসলামী বাংলাদেশ নেতাকর্মীরা''** মাইক্রোবাসের উপর গ্রেনেড হামলা চালায়। গাড়ী চালক (বাদী) বিকট শব্দ শুনে পেছনে তাকিয়ে দেখেন মাইক্রোবাসটি ছিন্ন ভিন্ন এবং ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মাইক্রোবাসের কাছে গিয়ে বাদী দেখতে পান যে, সিনিয়র সহকারী জজ সোহেল আহম্মেদ নিহত এবং সিনিয়র সহকারী জজ জগন্নাথ পাড়ে, পিয়ন আব্দুল মান্নান ও অজ্ঞাতনামা একজন যুবক মারাত্মক আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিলে সিনিয়র সহকারী জজ জগন্নাথ পাড়ে মারা যান। এ ঘটনায় (১) ঝালকাঠি থানার মামলা নং- ১১, তারিখ ১৪/১১/২০০৫ ধারা ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদির আইনের ৩/৪/৫/৬ (২) ঝালকাঠি থানার মামলা নং- ১২, তারিখ ১৪/১১/২০০৫ ধারা ৩০২/৩৪ দঃবিঃ ০২টি মামলা রুজু হয় এবং সিআইডি কর্তৃক তদন্ত হয়। সিআইডি কর্তৃক তদন্ত শেষে বিজ্ঞ আদালতে ০৮ জন আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল হয়।

মামলাটি বিজ্ঞ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, বরিশাল বিচারক মহোদয় গত ০৯/০২/২০০৬ ইং তারিখ (১) ঝালকাঠি থানার মামলা নং- ১১, তারিখ ১৪/১১/২০০৫ ধারা ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদির আইনের ৩/৪/৫/৬ চার্জ গঠন হইলে আংশিক রায় ঘোষনা করেন। রায়ে আসামী (১) আতাউর রহমান সানী, (২) আব্দুল আউয়াল, (৩) এফতেখার হাসান @ আল মামুন, (৪) শায়খ আব্দুর রহমান, (৫) সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই, (৬) মোল্লা ওমর, (৭) খালেদ সাইফুল্লাহদেরকে বিজ্ঞ আদালত প্রত্যেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। একই ঘটনায় দণ্ডবিধি আইনের রুজুকৃত মামলা নং-১২, তারিখ ১৪/১১/২০০৫ ধারা ৩০২/৩৪ দঃ বিঃ বিচার মূলতবী থাকে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রাক্তন সংসদ সদস্য মমতাজ উদ্দিন হত্যা

গত ০৬/০৬/২০০৩ ইং তারিখ রাত অনুমান ২২.১০ ঘটিকার সময় প্রাক্তন সংসদ সদস্য মমতাজ উদ্দিন নাটোর জেলাধীন গোপালপুর হতে মোটর সাইকেল যোগে তার নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে লালপুর থানাধীন নেঙ্গুপাড়ায় পথে অজ্ঞাত নামা দুস্কৃতকারীরা মাননীয় সংসদ সদস্যকে আটক করে উপর্যুপুরি ছুরিকাঘাতে হত্যা করে এবং তার সহকর্মীকে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক জখম করে। এ সংক্রান্তে উক্ত সংসদ সদস্যের ভাই এ্যাডঃ আবুল কালাম আজাদ থানায় এজাহার দিলে লালপুর (নাটোর) থানার মামলা নং-৬, তারিখ ০৭/০৬/২০০৩ ধারা ৩৪১/৩২৬/৩০২ দঃ বিঃ ০১টি নিয়মিত মামলা রুজু হয়। মামলাটি সিআইডি কর্তৃক তদন্ত শেষে (১) মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ, (২) বাবু @ বাবর @ শুকুর, (৩) ফারুক, (৪) মোঃ আনিছুর রহমান @ আনিছ, (৫) আলম, (৬) মন্টু, (৭) শুকুর বাবু, (৮) শামীম, (৯) সুজন, (১০) আয়নাল, (১১) মিঠু, (১২) আসলাম, (১৩) আঃ রশিদসহ সর্বমোট ১৩ জন আসামীদের বিরুদ্ধে লালপুর (নাটোর) থানার অভিযোগপত্র নং-৭, তারিখ ২১/০১/২০০৪ ধারা ৩৪১/৩২৪/৩০২/ ৩৪/১০৯ দঃ বিঃ দাখিল করেন। মামলাটি বর্তমানে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল রাজশাহীতে বিচারাধীন আছে।

রাজশাহী জেলাজুড়ে আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের ওপর চলে নির্মম নির্যাতন

নির্বাচনের পরদিন রাতে গোদাগাড়ী উপজেলার আদিবাসী গ্রাম গোপালপুরে হামলা চালানো হয়। একই দিন থেকে পুঠিয়া ও দূর্গাপুর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে হামলা নির্যাতন চলতে থাকে আওয়ামীলীগ কর্মী-সমর্থকদের ওপর। দূর্গাপুরের ঝালুকা গ্রামে সংখ্যালঘুদের বাড়ীতে গিয়ে হুমকি প্রদান ও গরু লুট করা হয়। সুখানদি, হরিরামপুর, আনোলিয়া, ব্রাহ্মপুর গ্রামে হামলা চলে। অনেকের নিকট থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা হয়। কারো কারো পুকুরের মাছ লুট করা হয়েছে। কোন কোন এলাকায় পানের বরজ ধ্বংস করা হয়েছে। সুখানদি গ্রামের সামছুল হক, মনির উদ্দিন, আলীমুদ্দিন, নুরসহ অনেকের বাড়ীঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে। এই গ্রামের শত শত লোক ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। হাড়িয়াপাড়া, গৌরীহার, ঝালুকা, শাইবাড়ী, কাঠাঁলবাড়ীয়াসহ বিভিন্ন গ্রামে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এখানকার লোকদের কাছে উচ্চহারে চাঁদা দাবী করা হয়। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। গত ১৩/১০/২০০১ ইং তারিখ দাউদকান্দি কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে অধ্যক্ষ জনাব মতিউর রহমানের মোবাইল ফোনটি কেড়ে নিয়ে তাকে লাঞ্চিত করা হয়। তার নিকটে কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করা হয়েছিল। গত ১২/১০/২০০১ ইং তারিখ পুঠিয়া উপজেলার সাতবাড়ীয়া বৈষ্ণব পাড়ার কালিমন্দিরটি ভেঙ্গে ফেলে সন্ত্রাসীরা।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতার প্রাপ্ত অভিযোগ, ঘটনার বিবরণ ও ঘটনার সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের প্রতিবেদন খণ্ড ২, খণ্ড ৩, খণ্ড ৪ ও খণ্ড ৫- এ জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক চিহ্নিত করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১।	শেখ হাসিনা (সম্পাদনা)	ঃ	বিএনপি-জামাত জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নমুনা-১, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ফেব্রুয়ারী ২০০৫, ঢাকা।
২।	শেখ হাসিনা (সম্পাদনা)	ঃ	বিএনপি-জামাত জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নমুনা-২, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ফেব্রুয়ারী ২০০৬, ঢাকা।
৩।	শেখ হাসিনা (সম্পাদনা)	ঃ	বিএনপি-জামাত জোট সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার নমুনা-৩, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নভেম্বর ২০০৬, ঢাকা।
৪।	শাহরিয়ার কবির	ঃ	ঃ বাংলাদেশে মানবাধিকার ও সাম্প্রদায়িকতা, চারুলিপি প্রকাশন, ফেব্রুয়ারী ২০০৩, ঢাকা।
৫।	A.M.A. Muhith, Noor-ul-Alam Lenin & others (Edited)		Valley of Death Bangladesh Awami League, April 2005, Dhaka.
৬।	শাহরিয়ার কবির (সম্পাদনা)	ঃ	শ্বেতপত্র-বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন, ১ম খন্ড (প্রথম পর্ব), একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, অক্টোবর ২০০৫, ঢাকা।
৭।	শাহরিয়ার কবির (সম্পাদনা)	ঃ	শ্বেতপত্র-বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন, ১ম খন্ড (২য় পর্ব), একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, অক্টোবর ২০০৫, ঢাকা।
৮।	শাহরিয়ার কবির (সম্পাদনা)	ঃ	শ্বেতপত্র-বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন, ২য় খন্ড, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, অক্টোবর ২০০৫, ঢাকা।
৯।	কাজী মুকুল(সম্পাদনা)	ঃ	বাংলাদেশের মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় সম্মেলন, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, জুলাই ২০০৫, ঢাকা।
১০।	Shahriar Kabar	ঃ	Recent Persecution of minorities in Bangladesh, South Asian People's Union against Fandamentalism & Communalism, November 2006, Dhaka.
১১।	শাহরিয়ার কবির	ঃ	আমাদের বাচঁতে দাও, SOS, (ডিভিডি), A journey into the land gored by communal persecution, ঢাকা।
১২।	প্রদীপ মালাকার	ঃ	বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংখ্যালঘু নির্যাতন, বহতা প্রকাশনা, এপ্রিল ২০০৬, নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

১৩।	র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধূরী (সম্পাদক)	ঃ	মত ও পথ - একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পাক্ষিক, বর্ষ-১, সংখ্যা-১২, ফেব্রুয়ারী ২০০৩, ঢাকা।
১৪।	Shahriar Kabir	ঃ	Violation of Human Rights by the Coalition Government of Bangladesh, Forum for ecular Bangladesh, September 2006, Dhaka.
১৫।	Sentre for Research and Information	ঃ	A Rigged Election:An Illegitimate Goverment, Bangladesh Election 2001, May 2002, Dhaka.
১৬।	মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ	ঃ	মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ চট্রগ্রাম চিত্র, প্রামান্য দলিল ঃ সেপ্টেম্বর ২০০১- ফেব্রয়ারী ২০০২, কনভেনশন কমিটি, চট্টগ্রাম, চিত্র ১৪০৮ বাংলা, চট্টগ্রাম।
১৭।	সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন	ঃ	নির্যাতনের দলিল-২০০১ ঃ নির্বাচন-পূর্ব ও নির্বাচন-উত্তর সংখ্যালঘু নিপীড়ন, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, জানুয়ারী ২০০২, ঢাকা।
১৮।	রনজিত কুমার দে, রানা দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য	ঃ	নির্যাতিত সংখ্যালঘু বিপন্ন জাতি, সম্পাদনা পর্ষদ, জানুয়ারী ২০০২, চট্রগ্রাম।
১৯।	অজয় রায়	ঃ	সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা এবং মানবাধিকার প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ -২৬ জুন ২০০৩ তারিখে জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতা, একাত্তরের ঘাতক দালাল নিমূল কমিটি, ঢাকা।
২০।	Human Rights and Peace for Bangladesh (HRPB)	ঃ	Human Rights Magazine-2009, Human Rights and Peace for Bangladesh(HRPB), November, 2009, Dhaka.
২১।	শওকত মিলটন	ঃ	দক্ষিনাঞ্চলে সংখ্যালঘু নির্যাতন প্রেক্ষাপট ঃ জাতীয় নির্বাচন ২০০১, বীথি শাহনাজ, ২০০৩, বরিশাল।
২২।	আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	ঃ	ভোলা-৪ নির্বাচনি এলাকায় নির্যাতনের তথ্য চিত্র-২০০১, সংসদ সদস্য , আওয়ামীলীগ, ২০০৯, ভোলা।
২৩।	জাতীয় কনভেনশন	ঃ	চাদরটা সরিয়ে দাও, Away the Covers, She Said, জাতীয় কনভেনশন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, ২০০২, ঢাকা।

২৪।	Shahriar Kabir and Kazi Mukul	ঃ	12 years Movement Against Fundamentalism and Communalism, Pictorial History of Nirmul, Committee`s Movement, May 2004, Dhaka.
২৫।	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	ঃ	রক্তাক্ত বাংলাদেশ লাঞ্ছিত মানবতা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, আগষ্ট ২০০৫, ঢাকা।
২৬।	বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	ঃ	Rape of a Nation, ধর্ষিত বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জুন-২০০২, ঢাকা।
২৭।	Bangladesh Hindu Bouddha Christion Oikhy Parishad	ঃ	Communal Attack and Repression on Minority in Bangladesh, Jan-Dec, 2002, March 2003, Dhaka.
২৮।	Bangladesh Hindu Bouddha Christion Oikhy Parishad	ঃ	Communal Attack and Repression on Minority in Bangladesh, Jan-Dec, 2003, March 2004, Dhaka.
২৯।	Bangladesh Hindu Bouddha Christion Oikhy Parishad	ঃ	Communal Attack and Repression on Minority in Bangladesh, Jan-Dec, 2004, April 2005, Dhaka.
৩০।	Bangladesh Hindu Bouddha Christion Oikhy Parishad	ঃ	Communal Attack and Repression on Minority in Bangladesh, Jan- Dec, 2005, April, 2006, Dhaka.
৩১।	Bangladesh Hindu Bouddha Christion Oikhy Parishad	ঃ	Communal Attack and Repression on Minority in Bangladesh, Jan-Dec,2006, March, 2007, Dhaka.
৩২।	Bangladesh Hindu Bouddha Christion Oikhy Parishad	ঃ	Communal Attack and Repression on Minority in Bangladesh, Jan-Dec,2007, April 2008, Dhaka.

৩৩।	Inquiry Commission Report	ঃ	Report of the People`s Inquiry Commission on Violence against Commuunity in Bangladesh ,Committee for Protecting Citizen`s Rights and Resisting Communalism, December 2002, Dhaka.
৩৪।	গণতদন্ত কমিশন	ঃ	সংখ্যালঘু নির্যাতন, গণতদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি, ডিসেম্বর, ০০২, ঢাকা।
৩৫।	আইন ও সালিশ কেন্দ্র (Ain o Salish Kendro)	ঃ	Bangladesh : Violence against Hindus in September and October 2001, December 2001, Dhaka.
৩৬।	রীট পিটিশন-৬৫৫৬/২০০১	ঃ	আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক রীট পিটিশন নং-৬৫৫৬/২০০১ এর সংযুক্ত তথ্য, নভেম্বর ২০০১, ঢাকা।
৩৭।	Bangladesh Hindu, Buddhist & Christian Unity Council	ঃ	Bangladesh - A Portrait of Covert Genocide, Third Edition, May 2004,USA.
৩৮।	প্রকাশিত সংবাদ	ঃ	দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, Daily Star- এ প্রকাশিত নির্বাচন -২০০১ পরবর্তী সহিংসতার প্রতিবেদন/সংবাদ, ০২ অক্টোবর ২০০১ হতে ৩০ জুন ২০০২), ঢাকা।